চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী
১৯টি সত্য ঘটনার এক অনবদ্য সংকলন

যে গল্পে হৃদয় গলে

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

হৃদয় গলে– ২

যে গল্পে হৃদয় গলে

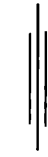

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম. এ. [ফার্স্ট ক্লাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়]
দাওরায়ে হাদীস [ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড]
প্রাক্তন শিক্ষক, মাদরাসা দারুর রাশাদ, মিরপুর–১২ ঢাকা
শিক্ষা সচিব, নূরিয়া ইসলামিয়া মাদরাসা, সাটিরপাড়া, নরসিংদী

সম্পাদনায়

মাওলানা লিয়াকত আলী
সহ সম্পাদক, দৈনিক নয়া দিগন্ত

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

:-সূচীপত্র:-

যে গল্পে হৃদয় গলে [সিরিজ-২]

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবা: ০১৭১২৭৯২১৯৩, ০১৯২৩২২৯০৯৬, ০১৮১১৮২৮০৩১

পরিবেশক
মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
মে ২০০৩

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই ২০০৩

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মুদ্রণে
ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
আবু দাউদ মুহাম্মদ জাকারিয়া

বর্ণ বিন্যাস
মাওলানা হুসাইন আহমাদ সাইফুল্লাহ
শিক্ষক, মাদরাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া
৯/১, আরএনডি রোড, লালবাগ, ঢাকা

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

:-সূচীপত্র:-

হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ

১. যে গল্পে হৃদয় গলে [১ম খণ্ড/ সিরিজ-১]
২. যে গল্পে হৃদয় গলে [২য় খণ্ড/ সিরিজ-২]
৩. যে গল্পে হৃদয় গলে [৩য় খণ্ড/সিরিজ-৩]
৪. যে গল্পে অশ্রু ঝরে [সিরিজ-৪]
৫. যে গল্প হৃদয় কাড়ে [সিরিজ-৫]
৬. যদি এমন হতাম [সিরিজ-৬]
৭. ঈমানদীপ্ত কাহিনী [সিরিজ-৭]
৮. অশ্রুভেজা কাহিনী [সিরিজ-৮]
৯. যে গল্পে হৃদয় জুড়ে [সিরিজ-৯]
১০. যে গল্পে হৃদয় কাঁদে [সিরিজ-১০]
১১. হারানো দিনের সোনালী কাহিনী [সিরিজ-১১]
১২. হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী [সিরিজ-১২]
১৩. সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী [সিরিজ-১৩]
১৪. সোনালী সংসার [উপন্যাস] [সিরিজ-১৪]
১৫. নারী জীবনের চমৎকার কাহিনী [সিরিজ-১৫]
১৬. যে গল্পে হৃদয় কাঁপে [সিরিজ-১৬]
১৭. যে গল্পে মানুষ গড়ে [সিরিজ-১৭]
১৮. গল্পে গল্পে সোনালী অতীত [সিরিজ-১৮]
১৯. হৃদয়বিদারক করণ কাহিনী [সিরিজ-১৯]
২০. যে গল্পে ঈমান বাড়ে [সিরিজ-২০]
২১. ব্যথিত হৃদয় [উপন্যাস] [সিরিজ-২১]
২২. অব্যক্ত যন্ত্রণা [উপন্যাস] [সিরিজ-২২]
২৩. জীবন গড়ার টুকরো কথা-১ [সিরিজ-২৩]
২৪. আদর্শ কিশোর -কিশোরী-১ [সিরিজ-২৪]
২৫. আদর্শ যুবক-যুবতী-১ [সিরিজ-২৫]
২৬. আদর্শ স্বামী-স্ত্রী-১ [সিরিজ-২৬]
২৭. যে গল্পে হৃদয় ভরে [সিরিজ-২৭]
২৮. যে গল্পে হৃদয় সাজে [সিরিজ-২৮]
২৯. যে গল্পে হৃদয় খুলে [সিরিজ-২৯]
৩০. জীবন গড়ার টুকরো কথা-২ [সিরিজ-৩০]
৩১. হৃদয়ছোঁয়া ঘটনাবলী-১ [সিরিজ-৩১]
৩২. জীবন গড়ার টুকরো কথা-৩ [সিরিজ-৩২]

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের

বাণী ও দোয়া

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ,

স্নেহাস্পদ মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম সাহেবের লিখিত **'যে গল্পে হৃদয় গলে'** নামক বইখানা যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটুকু দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি তথাপি মাঝে মধ্যে যতটুকু দেখতে পেরেছি তা আমার নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছে। আমি মনে করি, সচ্চরিত্র গঠন, বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলী অর্জন এবং ঘুমন্ত মুমিনের ঝিমিয়ে পড়া ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত ও শাণিত করে তুলতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে এবং নবীন এ কলম সৈনিকের ক্ষুরধার লেখনিতে নষ্ট সাহিত্যের জয়জয়কার কিছুটা হলেও বিদূরিত হবে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যদি মনোযোগ সহকারে আমলের নিয়তে বইটি বারবার পাঠ করেন তাহলে তাদের খুবই উপকার হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং লিখককে এর উত্তম আজর ও বিনিময় দান করেন।

আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম
২০শে এপ্রিল ২০০৩

:-সূচীপত্র:-

দারুল উলূম দত্তপাড়ার সম্মানিত মুহাদ্দিস নরসিংদী কেন্দ্রীয় বাজার
জামে মসজিদের খতীব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা
মুফতী আলী আহমাদ হুসাইনী সাহেবের

অভিমত ও দোয়া

আলহামদুলিল্লাহ। পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, তিনি উদীয়মান লেখক স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলামকে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তার লিখিত 'যে গল্পে হৃদয় গলে' নামক বইখানার দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন। আমার মনে হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন মুসলমানদের উপর জুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আগ্রাসন চালিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছে, যখন মুসলিম নারী-পুরুষ ও শিশুদের বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, যখন মুসলমানদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও নৈতিক অধঃপতন চরম আকার ধারণ করেছে, ঠিক তখনই এ জাতীয় একখানা গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা, উন্নত চরিত্র গঠন ও জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদের লাঞ্ছনার জীবনের অবসান ঘটার সম্ভাবনা নেই। আজীজ লেখক বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে মূলতঃ এ কথাটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই বইখানা সব বয়সের সকল পাঠককে কেবল গল্প পাঠের অনাবিল আনন্দই দান করবে না বরং সাথে সাথে যথার্থ জ্ঞান অর্জন, চরিত্র গঠন ও জেহাদী চেতনাকে শাণিত করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন মাওলানাকে একজন ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসেবে কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে আরও বই-পুস্তক রচনা করে ঘুমিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

আলী আহমাদ হুসাইনী
৩০শে এপ্রিল ২০০৩

:-সূচীপত্র:-

দু'টি কথা

চরিত্র মানুষের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। একজন মানুষের মধ্যে যখন সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, খোদাভীরুতা, পরোপকার, ন্যায়পরায়নতা, ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা ও ত্যাগের ন্যায় প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে তখনই তাকে চরিত্রবান বলা হয়। চরিত্রবান ব্যক্তির উন্নত ব্যবহার ও শীতল পরশে মানুষ সকল দুঃখ দুর্দশা নিমিষেই ভুলে যায়। দুনিয়াতেই লাভ করে অনাবিল স্বর্গীয় সুখ।

আমাদের বর্তমান সমাজের ক্রমবর্ধমান চারিত্রিক অবক্ষয় রোধ করে একটি আদর্শ ও চরিত্রবান জাতি গঠন করার উদ্দেশ্যেই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ বইতে আমি হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা ও দরদ দিয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী সত্য ঘটনাগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সংশ্লিষ্ট ঘটনার শিক্ষণীয় দিকগুলো সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তাছাড়া এ বইয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের উপর যে জঘন্য মানবতা বিরোধী অপকর্ম ও নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে তার কিছু খন্ড চিত্রও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য হল, মুসলিম সমাজের সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল করে দেয়া যে, এখনই যদি আমরা জেহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার কার্যকর বদলা নিতে উদ্যোগী না হই, তাহলে মনে রাখতে হবে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জন্য আরও মারাত্মক পরিণতি অপেক্ষা করছে।

'যে গল্পে হৃদয় গলে'র দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের এ শুভ মুর্হূতে মহান আল্লাহর দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যিনি প্রথম খন্ড প্রকাশের মাত্র ৪/৫ মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করার তাওফীক দিয়েছেন। সাথে সাথে আমি তাদের প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগীতা করেছেন।

প্রথম খন্ড পড়ে উপকৃত হয়েছেন বলে যারা জানিয়েছেন এবং এ ধরণের বই সকল শ্রেণীর লোকের জন্য পাঠ করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য

করেছেন তাদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আশা করি প্রথম খন্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খন্ডও আপনাদের মনের খোরাক জোগাবে এবং সচ্চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

আমি এ বইতে থেকে যাওয়া ভুল ভ্রান্তির জন্য সকলের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টির প্রত্যাশী। এ ব্যাপারে আমাকে অবহিত করলে এবং বইটির মানোন্নয়নের জন্য কোন পরামর্শ দিলে তা অবশ্যই কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার বিনীত আরয, আপনারা কেউ শুধুমাত্র আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে বইটি পাঠ করবেন না। বরং ঈমানের মজবুতী, বিভিন্ন মানবীয় গুণাবলী অর্জন, সচ্চরিত্র গঠন, জেহাদী চেতনা সৃষ্টি এবং যাবতীয় দোষ থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বারবার ঘটনাগুলো পাঠ করবেন। সম্ভব হলে অপরকে পাঠ করে শুনাবেন। আর দোয়া করবেন, মহান রাব্বুল আলামীন যেন বইটি কবুল করেন এবং আমার উদ্দেশ্যকে সফল করেন।

১০ এপ্রিল ২০০৩ইং
বি-বাড়ীয়া

বিনয়াবনত
মোঃ মুফীজুল ইসলাম ভাদুঘরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম খন্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খন্ডও অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাওয়ায় মহান আল্লাহর দরবারে আনন্দ বিগলিত হৃদয়ে শতকোটি শুকরিয়া আদায় করছি। বইখানা পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায় একজন লেখক হিসেবে সীমাহীন খুশি ও উৎসাহ বোধ করছি। প্রথম সংস্করণের ভুল-ত্রুটিগুলো এ সংস্করণে যথাসম্ভব সংশোধন করা হয়েছে। বইটির মানোন্নয়নের জন্য যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের নিকট আমি আবারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই বইখানা পাঠ করে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

-লেখক
৩০ জুন ২০০৩ইং

:-সূচীপত্র:-

☞ ফাঁসির মঞ্চে প্রেমের পরীক্ষা-১ ১০
☞ ফাঁসির মঞ্চে প্রেমের পরীক্ষা-২ ১২
☞ ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা ১৮
☞ দাম্ভিকতার করুণ পরিণতি ২৪
☞ এমন ঈমানই অর্জন করা চাই ২৮
☞ ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায় ৩৩
☞ অবৈধ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি ৪১
☞ বর্বরতা ও পাশবিকতার একটি নির্মম চিত্র ৫১
☞ মুসলমানদের ইজ্জত নিয়ে হোলি-খেলা ৫৫
☞ আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা ৫৭
☞ মেয়েদের তো এমনই হওয়া চাই ৬০
☞ মাকে কষ্ট দেওয়ার নির্মম পরিণতি ৭০
☞ রক্তাক্ত গুজরাট ঃ মানবতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ৮২
☞ সচেতন হও, মুসলিম জাতি! ৮৬
☞ মুসলিম কিশোরীর আশ্চর্য প্রতিশোধ ৮৯
☞ আল্লাহর অলীদের সাথে বেয়াদীর করুণ পরিণতি ৯৫
☞ কত বড় রাযযাক তিনি! ৯৮
☞ তোমরা কি ঐসব লোক যারা..... ১০১
☞ মুজাহিদের তামান্না ১০৯

:-সূচীপত্র:-

ফাঁসির মঞ্চে প্রেমের পরীক্ষা-১

গাজী ইলমুদ্দীন। একটি নাম। একটি ইতিহাস। ঝিমিয়ে পড়া মুসলিম জাতির অনুপ্রেরণার উৎস। রাসূল প্রেমে আত্মহারা টগবগে এ যুবক নিজেকে ফাঁসির মঞ্চে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করে দিয়ে রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে তা গর্বের সাথে স্মরণ রাখবে।

ইহুদী-খৃষ্টান তথা সকল কাফের মুশরিক কখনোই মুসলমানদের বন্ধু ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। যেমন, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। (সূরা মায়িদাহ ঃ ৫১)

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও অনেক সময় কাফেরদেরকে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা প্রদর্শন করতে দেখা যায় তথাপি মুসলিম জাতিকে একথা খুব ভাল করেই স্মরণ রাখতে হবে যে, এ সকল সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন তারা সুদূরপ্রসারী কোন নীল নক্শা বাস্তবায়ন ও আপন স্বার্থ উদ্ধারের জন্যেই করে থাকে। তারা দুনিয়াতে প্রভুত্ব চায়। চায় সমগ্র পৃথিবীর রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে। আর এ সকল নাপাক উদ্দেশ্য হাসিলের পথে তাদের একমাত্র বাধা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম জাতি। তাই ছলে-বলে কৌশলে তারা বাঁধার এ প্রাচীরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।

ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে ধ্বংস করার জন্য বেঈমান কাফেররা হাজারো ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। আল্লাহর পেয়ারা রাসূল আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টাও

তাদের সেইসব ষড়যন্ত্রেরই অংশ। কিন্তু সিংহের জাতি মুসলমানগণ কখনোই কাফেরদের এ সকল ঘৃণ্য অপচেষ্টাকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। বরং জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে হলেও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-সম্মান ও মহান চরিত্রের উপর আক্রমণকারী পাপাত্মাগুলোকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে তাঁর প্রতি প্রেম ও ভালবাসার অপূর্ব নজীর স্থাপন করেছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত দুটি ঘটনা সম্মানিত পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি-

রঙ্গিলা রাসূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত-পবিত্র ও উন্নত চরিত্রে মারাত্মক হামলা চালিয়ে লাহোরের 'রাজপাল' নামক এক আর্যসমাজী পান্ডা কর্তৃক লিখিত একটি জঘন্য পুস্তক। এ পুস্তকে এমন সব কাল্পনিক মিথ্যা অপবাদের সমাবেশ ঘটানো হয় যে, এর প্রতিবাদে সমগ্র উপমহাদেশের ক্ষুব্ধ মুসলিম সত্তা যেন এক সাথে চিৎকার দিয়ে উঠে।

গাজী ইলমুদ্দীন ছিলেন ক্ষোভ ও আক্রোশে ফেটে পড়া সেইসব তৌহিদী জনতারই একজন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, যে পাপিষ্ঠ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্রের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁর নির্মল ও নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপনের অপচেষ্টা চালিয়েছে, তাকে তিনি যে কোন উপায়ে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিবেনই। তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তার অস্থির চিত্ত কখনো শান্ত হবে না।

গাজী ইলমুদ্দীন তার প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়ন করার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন সুযোগ পেয়ে সেই আশেকে রাসূল নবী-প্রেমে আত্মহারা বীর যুবক প্রকাশ্য দিবালোকে পাপাত্মা রাজপালের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে অগণিত মুমিন হৃদয়ের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

গাজী ইলমুদ্দীনের ছুরির আঘাতে সাথে সাথে দুরাত্মা রাজপালের ভবলীলা সাঙ্গ হয়। সে বুঝতে পারে, রাসূল প্রেমীরা এখনও জীবিত আছে।

যা হোক, রাজপালকে হত্যার দায়ে গাজী ইলমুদ্দীনকে গ্রেফতার করা হয় এবং এক পর্যায়ে ইংরেজের বিচারালয়ে তাঁর

প্রতি ফাঁসির আদেশ হয়। নিম্ন আদালতের সে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করা হয়।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ আপীল দায়ের করার পর কারাগারে গিয়ে গাজী ইলমুদ্দীনের সাথে সাক্ষাত করেন এবং এ মর্মে আবেদন করেন যে, তিনি যেন নিম্ন আদালতে প্রদত্ত জবানবন্দী অস্বীকার করে শুধু এতটুকু বলেন যে, আমি রাজপালকে হত্যা করিনি।

কিন্তু আল্লাহর হাবীবের সে আশেক যুবক এ বলে সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন যে, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি পিয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনা থেকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। আমি তার পাক কদমে লুটিয়ে পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। আপনারা অনর্থক আমার সে আকুল প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত করবেন না।'

শেষ পর্যন্ত এ বীর যুবক এক প্রকার স্বেচ্ছায়ই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে আকাঙ্খিত শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন। লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুসলমান তার নামাযে জানাযা আদায় করে লাহোরের অমর সাধক মিয়া মীরের মাজার-পার্শ্বে তাঁকে দাফন করেন। ❐

ফাঁসির মঞ্চে প্রেমের পরীক্ষা-২

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্রের উপর বিভিন্ন প্রকার কটূক্তি ও অপবাদ আরোপ করে ২য় বইটি লিখা হয় ১৯৩৩ সালে। বইটির নাম "হিষ্ট্রী অব ইসলাম"। এ বইটি 'নাথুরাম' নামক এক পাপিষ্ঠ রচনা করে। সে ছিল তদানীন্তন সিন্ধু প্রদেশের আর্য সমাজ নামক সংগঠনের প্রধান সম্পাদক। এ বইয়ের বিরুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারা লেখকের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত মামলা চলতে থাকে। এক পর্যায়ে বৃটিশ আইনে লেখকের দু'বছর জেল ও মামুলী ধরণের জরিমানা হলেও আপীল দায়ের করার পর উচ্চতর আদালত আপীলের শুনানী সাপেক্ষে দুর্বৃত্ত নাথুরামকে জামিনে মুক্ত করে দেয়। এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ক্ষোভে-দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন। তারা

সংখ্যাগুরু হিন্দু সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠির পক্ষ থেকে আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের বিরুদ্ধে একের পর এক পরিচালিত এসব জঘন্য হামলার কি প্রতিকার করা যায় এ নিয়ে পরামর্শ সাপেক্ষে আন্দোলন শুরু করলেন।

এদিকে 'আব্দুল কাইয়ূম' নামক ২৩/২৪ বছরের এক যুবক করাচীর সদর জামে মসজিদে নামায আদায় করার পর ইমাম সাহেবের মুখে শুনতে পেলেন যে, প্রভাবশালী এক পাপাত্মা পেয়ারা নবীজির প্রতি ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঈমানী চেতনাকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে।

আব্দুল কাইয়ূম ছিলেন অত্যন্ত ধার্মিক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কিছুদিন আগেকার গাজী ইলমুদ্দীনের বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের কথা জানতেন। মুসলিম যুবকরা তখনকার দিনে গর্বের সাথে গাজী ইলমুদ্দীনের নাম উচ্চারণ করত।

ইমাম সাহেবের অগ্নিঝরা বক্তব্য শুনে আব্দুল কাইয়ূমের ঈমানী চেতনা তাকে অস্থির করে তুলল। ভাবলেন, রাসূলের আশেক কোন যুবক কি এখন বেঁচে নেই? থাকলে কিভাবে, কোন সাহসে আর্য সমাজের এই দুবৃর্ত্ত এমন ঘৃণ্য তৎপরতায় লিপ্ত হল? কথা কয়টি তার মস্তিস্কে ঘুরপাক খেতে খেতেই তিনি তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি নিজে বুকের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে হলেও ওদের দেখিয়ে দিবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভক্ত উম্মতেরা এখনও বেঁচে আছে। তার পবিত্র মর্যাদার খাতিরে জীবন উৎসর্গ করার মত লোকের এখনও অভাব হয়নি। মনে মনে কর্তব্য স্থির করে তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে পকেটে রক্ষিত সামান্য ক'টি টাকা দিয়েই বাজার থেকে ধারালো একটি ছুরি ক্রয় করে নিলেন।

১৯৩৪ সাল। সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখ। দু'জন ইংরেজ জজ করাচীর উচ্চ আদালতে নাথুরামের আপীল মামলার শুনানী গ্রহণ করছেন। আদালত প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। আইনজীবী ও মামলার তদবীরকারকগণের দ্বারা আদালত কক্ষ পরিপূর্ণ। বিচারপতিগণ নাথুরামের আইনজীবীর পক্ষ থেকে পেশকৃত বক্তব্য শ্রবণ করছেন।

আব্দুল কাইয়ূম সদ্য কেনা ধারালো ছুরিটি লুকিয়ে রেখে ধীর-শান্ত পদক্ষেপে আদালত কক্ষে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি আইনজীবীদের পিছনের সারিতে দর্শকদের সাথে একটি কুরসীতে বসলেন। নাথুরামকে তিনি চিনতেন না। তাই মামলার কার্যধারা লক্ষ্য করে তিনি প্রথমে তার শিকার ঠিকমত সনাক্ত করে নিলেন। দেখলেন, সেই কুখ্যাত নাথুরাম তার পাশের চেয়ারেই বসে আছে। অত্যন্ত গভীরভাবে তিনি একবার তার আপাদমস্তক দেখে নিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর বিচারকের একটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য নাথুরাম উঠে দাঁড়াল। পাশে উপবিষ্ট আব্দুল কাইয়ুম মনে মনে বললেন, এই তো সুযোগ! সুতরাং আর দেরী নয়। তিনি ক্ষিপ্ত বাঘের ন্যায় উঠে দাঁড়ালেন এবং কক্ষ ভর্তি লোকজন কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখের পলকে পাপিষ্ঠ নাথুরামের কণ্ঠনালী বরাবর তীক্ষ্ণ ছুরি আমূল বসিয়ে দিলেন। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। কিন্তু তিনি থামলেন না। ছুরি টেনে বের করলেন এবং একের পর এক আরও দুটি অব্যর্থ আঘাত করে বিশালবপু নরাধমকে একেবারে ধরাশায়ী করে ছাড়লেন।

নাথুরামের চিৎকারে আদালত ভবন প্রকম্পিত হল। কামরা ভর্তি লোকগুলো কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু আব্দুল কাইয়ূমের মধ্যে মোটেও কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রচুর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন না। রক্ত মাখা ছুরিটা হাতে নিয়েই তিনি নির্ভীক বিজয়ী বীরের ন্যায় ধীর শান্ত ভাবে নিজেকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন।

এমন একটা লোমহর্ষক ঘটনা আদালত কক্ষে ঘটে গেছে এটা প্রথমে বাইরে অপেক্ষমান হাজার হাজার লোক বুঝতেই পারেনি। খবর প্রচারিত হওয়ার পর সহস্র কণ্ঠের তাকবীর ধ্বনীতে করাচীর আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।

আব্দুল কাইয়ূম পুলিশের হেফাজতে চলে যাওয়ার পর ইংরেজ জজ আসন ছেড়ে নেমে এলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি এই লোকটাকে খুন করেছ?

আব্দুল কাইয়ূম দেয়ালে ঝুলানো পঞ্চম জর্জের ছবিটির প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা তো আপনাদের রাজার ছবি। কেউ যদি এ রাজাকে অপমান করে তবে কি আপনারা তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করবেন না? এই পাপিষ্ঠ নাথুরাম আমার হৃদয় রাজ্যের সম্রাট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমন অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছে, যা আমার ঈমানী চেতনায় নিদারুণ আঘাত করে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। তাই আমি ওর নাপাক অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

আব্দুল কাইয়ূমের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা চালানো হলো। সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজন হল না। কারণ প্রকাশ্য আদালতে তিনি নিজেই স্বীকার করলেন যে, আমি নাথুরামকে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করেছি। বিচারে আব্দুল কাইয়ূমের মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণা করা হলো। রায় শুনে তিনি বিচারককে লক্ষ্য করে বললেনঃ

মাননীয় জজ! আমি আপনার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, আমাকে আপনি মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন। আমার তো একটিই জীবন! বিশ্বাস করুন, যদি আমার লক্ষ জীবন থাকতো, তবুও আমি আল্লাহর প্রিয় হাবীবের পূত-পবিত্র মর্যাদার জন্য তা লুটিয়ে দিতে মোটেও কুন্ঠিত হতাম না।

করাচির নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ এ রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল দায়ের করলেন এবং সৈয়দ মোঃ আসলাম নামক একজন শীর্ষ স্থানীয় আইনজীবীকে মামলা পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। উক্ত আইনজীবী যখন মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলার জন্য আব্দুল কাইয়ূমের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আপনি পূর্বোক্ত জবানবন্দী প্রত্যাহার করে নিলে আমাদের পক্ষে আপনার মুক্তির ব্যাপারে কাজ করে যাওয়া সহজ হবে। তখন রাসূল প্রেমে আত্মহারা এই সাচ্চা যুবক দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে বলে দিলেন ঃ

"বিচারকের সামনে আমি যে স্বীকৃতিমূলক জবানবন্দী দিয়েছি, তা প্রত্যাহার করে আমার পরকালীন পুরস্কার খাটো করতে পারবো না।"

অতঃপর উপায়ান্তর না দেখে জনাব আসলাম আদালতে এভাবে যুক্তি পেশ করলেন যে, আল্লাহর রাসূলের প্রতি মুসলমানদের যে শর্তহীন আনুগত্য এবং আবেগময় প্রেমের সম্পর্ক, সেটা ব্যাখ্যা করা শুধু কঠিনই নয়, অসম্ভবও বটে। এজন্য ইসলামী শরীয়তের বিধান হচ্ছে, যে কোনভাবে কেউ আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের মর্যাদা হানির চেষ্টা করলে তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

তিনি আরো বললেন, কাউকে যদি উস্কানী দিয়ে উত্তেজিত করা হয় এবং এ অবস্থায় যদি সে কাউকে হত্যা করে, তবে বৃটিশ আইনের ৩০২ নং ধারা মোতাবেক তাকে চরম পর্যায়ের শাস্তি দেয়া যায় না। যেমন, কেউ যদি তার স্ত্রী বা কন্যাকে কারো হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখে এবং সে উত্তেজিত হয়ে লাঞ্ছনাকারীকে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয় না।

মাননীয় বিচারক! মুসলমানদের হৃদয় রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, আল্লাহর প্রিয়নবী, দোজাহানের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-সম্মানে আঘাত করার চাইতে বড় উস্কানী একজন মুসলমানের পক্ষে আর কি হতে পারে? তাই আব্দুল কাইয়ূম আইনের উক্ত ধারা মোতাবেকই চরম শাস্তির পরিবর্তে লঘু দন্ড পাওয়ার অধিকারী।

জনাব! একজন মুসলমানের অনুভূতিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা কত উচ্চ এবং তাতে আঘাত লাগলে তার অনুভূতি কতটুকু আহত হয় তা আমি আপনাকে ভাষায় বুঝাতে পারবো না। আমি মাননীয় আদালতের সামনে একথা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, যতক্ষণ একজন মুসলমান জীবিত থাকবে, ততক্ষণ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য মর্যাদাহানিকর যে কোন তৎপরতার বিরুদ্ধে অকাতরে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হবে না। এক্ষেত্রে তারা আইনের ভ্রুকুটি বা ফাঁসির রজ্জুর প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করবে না।

বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তির প্রতি মোটেও গুরুত্ব না দিয়ে ইংরেজ বিচারকগণ আপীল খারিজ করে দিলেন।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ শেষ চেষ্টা হিসেবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, তারা তৎকালীন বড় লাটের নিকট গমন করবেন এবং আব্দুল কাইয়ূমের মৃত্যুদন্ড রহিত করে তা আজীবন কারাদন্ডে পরিবর্তন করার জন্য একটি আবেদন পেশ করবেন। কিন্তু রাসূল প্রেমিক আব্দুল কাইয়ূম কোন অবস্থাতেই করুণা ভিক্ষার আবেদনে স্বাক্ষর করতে সম্মত হলেন না। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত রক্ষার এ লড়াইয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করার জন্য বারবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ ব্যাপারটি নিয়ে আল্লামা ইকবালের নিকট হাজির হলেন। আল্লামা ইকবাল আব্দুল কাইয়ূম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

সে কি মানসিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছে ?

নেতৃবৃন্দ জবাবে বললেন, সে মানসিকভাবে দূর্বল তো হয়ইনি বরং অনুকম্পা ও দয়া প্রার্থনার দরখাস্তে দস্তখত করতে পর্যন্ত রাজী হচ্ছে না।

আল্লামা বললেন, সে কি বলে?

নেতৃবৃন্দ জবাব দিলেন, সে বলে, আমাকে পিয়ারা নবীজীর মর্যাদা রক্ষার এ জিহাদে শহীদ হতে দিন।

এবার আল্লামার কন্ঠ জড়িয়ে এলো। একটু ক্ষোভ মিশ্রিত স্বরেই তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর পেয়ারা হাবীবের এক আশেক যখন জীবন উৎসর্গ করে তার এশ্‌কের দাবী প্রমাণ করতে চায়, তখন আমাদের পক্ষে সে পবিত্র আকাঙ্খার পথে বাধা সৃষ্টি করা কি উচিত হবে?

এতটুকু বলে আল্লামা ইকবাল থেমে গেলেন। তিনি আর বলতে পারলেন না। তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হল।

অতঃপর নেতৃবৃন্দ নিরাশ হয়ে করাচী ফিরে এলেন। নির্ধারিত দিনে নবী-প্রেমিক আব্দুল কাইয়ূমের ফাঁসি কার্যকর হয়ে গেল। করাচীর হাজার হাজার মুসলমান এ অমর শহীদের লাশ জেল ফটক থেকে বহন করে আনলেন। জানাযা পড়লেন এবং পূর্ণ শহীদী মর্যাদায় তাঁকে সমাহিত করলেন।

কিছুদিন পর আল্লামা ইকবাল গাজী ইলমুদ্দীন ও আব্দুল কাইয়ূমের স্মরণে তার বিখ্যাত কবিতা 'লাহোর ও করাচী' রচনা করেন। এই কবিতারই একটি পংক্তি নিম্নরূপ ঃ

"এ শহীদদের জীবনের বিনিময় গির্জা অনুসারীদের কাছে চেয়ো না; যাদের রক্তের দাম কাবার চাইতেও বেশী।"

আলোচ্য ঘটনাদ্বয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে প্রতিটি মুসলমানকে এরূপ সংকল্প করা উচিত যে, আমি জীবিত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত-সম্মানে আঘাতদানকারী কোন পাপিষ্ঠ দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে পারবে না। জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু দিয়ে হলেও আমি পেয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র চরিত্রে অপবাদ আরোপকারী নরাধমকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েই ছাড়বো। ❐

ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

হযরত উমর (রা.) এর শাসন কাল। চতুর্দিকে মুসলমানদের জয়জয়কার। একের পর এক পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানগণ বিজয় পতাকা উড্ডীন করে চলেছেন। তাদের বিজয়ের পথে বাধা দেওয়ার সাধ্য যেন কারো নেই।

তৎকালীন সময়ে রোম আর পারস্য ছিল দুটি শক্তিধর রাষ্ট্র। তারা শক্তির বড়াই করতো। হযরত উমর (রা.) রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য পাঠালেন। মুসলিম মুজাহিদরা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বর্তমান ইতালির রাজধানী রোমের দিকে এগিয়ে চললেন।

এদিকে রোম সম্রাট মুসলমানদের অনেক কিংবদন্তীর কথা শুনেছেন। শুনেছেন তাদের অনেক বীরত্বপূর্ণ অবিশ্বাস্য কাহিনী। তিনি এও শুনেছেন যে, মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য বিজয় যাত্রার কারণ হলো তারা মৃত্যুকে পরওয়া করে না এবং ভয়-ভীতি বা প্রলোভনের সামনে কখনোই মাথানত করে না। এসব কথা রোম সম্রাটের বিশ্বাস হতো না। সে এগুলোকে কল্প-কাহিনী মনে করতো।

মুসলমান মুজাহিদরা রোম আক্রমণ করতে আসছে এ সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে সম্রাটের মনে কৌতূহল জাগলো যে, যদি এ যুদ্ধে কয়েকজন মুসলমানকে জীবিত বন্দী করতে পারি তাহলে আমি পরীক্ষা করে দেখবো যে, তারা কি পরিমাণ প্রলোভনকে প্রত্যাখান করতে পারে, আর কি পরিমাণ ভয়-ভীতি উপেক্ষা করতে পারে। তাই সে তার সেনাবাহিনীকে বলে দিল, যদি তোমরা রণাঙ্গণ থেকে মুসলমানদেরকে জীবিত বন্দী করে আনতে পার তাহলে তাদের মারধর না করে যত্ন সহকারে আমার নিকট পাঠিয়ে দিবে।

৫০/৬০ জন মুসলিম মুজাহিদের দলনেতা ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.)। রোমানদের সাথে মুসলমানদের তুমুল লড়াই শুরু হলে এক পর্যায়ে তিনি সঙ্গী সাথীসহ রোমানদের হাতে বন্দী হন। তাদের এ বন্দী হওয়ার পিছনে হয়তো একটি কারণ এও থাকতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা সকল বেঈমান-কাফের গোষ্ঠীকে বাস্তবেও দেখিয়ে দিতে চান যে, সত্যিকার অর্থেই মুসলমানগণ মৃত্যুকে ভয় করে না; টাকা-পয়সা আর ধন-ঐশ্চর্য্যের প্রলোভন দেখিয়ে কখনোই তাদেরকে সত্যের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করা যায় না।

যা হোক, সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক বন্দীদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সম্রাট প্রথমে আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) কে তার খাস কামরায় ডেকে বললো, দেখ, আমি খৃষ্টান। আমি খৃষ্ট ধর্মকে ভালবাসি। যদি তুমি তোমার ধর্ম ছেড়ে আমার ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে এখনই তোমার নামে আমার বিশাল সাম্রাজ্যের অর্ধেক লিখে দিব। শুধু তাই নয়, আমার একটি সুন্দরী ষোড়শী কন্যা আছে। তাকেও তোমার নিকট বিবাহ দেব। আমি মরে গেলে বাকী অর্ধেক সাম্রাজ্যের মালিক তুমি এমনিই হয়ে যাবে। তুমি হবে তখন রাষ্ট্রপ্রধান।

এ প্রস্তাব শুনে ঘৃণা আর ক্রোধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) এর সমস্ত দেহ কাঁপতে শুরু করল। আঘাত খাওয়া বাঘের ন্যায় তার সমস্ত সত্তা যেন একত্রে লাফিয়ে উঠলো। অতঃপর তার অগ্নিঝরা কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো,

হে রোমের কুকুর! তুমি কি দুনিয়ার বিনিময়ে আমার দ্বীন ক্রয় করতে চাও? দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে আমার ধর্ম কিনে নিতে চাও? বেওকুফ কোথাকার! খবরদার! এই নিকৃষ্ট বাজে কথা আমার সামনে আর কখনোই উচ্চারণ করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) এর বক্তব্যে সম্রাটের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সে হিংস্র হায়েনার রূপ ধারণ করলো। সে একটু অস্ফুট স্বরে বিড়বিড় করে বললো, আমি রোমের সম্রাট! সমস্ত রোমবাসী আমার কথায় উঠা-বসা করে!! আর এক দুর্বল বন্দী কি-না আমাকে চোখ রাঙ্গিয়ে কথা বলে!!! কত বড় স্পর্ধা তার! দাঁড়াও, এখনই মজা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অতঃপর সম্রাট তার অনুগত বাহিনীকে কড়া নির্দেশ দিয়ে বললো, যাও, এদেরকে এখনই জেল খানার প্রকোষ্টে আবদ্ধ কর। আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে যেন এক দানা খাদ্যও না দেয়া হয়, এক ফোটা পানিও না দেয়া হয়।

সম্রাটের নির্দেশ মোতাবেক তা-ই করা হল। আজ কয়েকদিন যাবত মুসলিম মুজাহিদদের খানা-পিনার সাথে কোন সাক্ষাত নেই। সকলেই নিস্তেজ ও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। মনে হয় মৃত্যু যেন তাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

এদিকে সম্রাট একজন বিজ্ঞ ডাক্তারকে এ বলে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন যে, তুমি তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। যখন দেখবে যে, এখন খানা না খেলে তারা মারা যাবে ঠিক তখনই আমাকে সংবাদ দিবে। কারণ আমার মূল উদ্দেশ্য হল, ওদের পরীক্ষা করা, মেরে ফেলা নয়।

ক্রমাগত কয়েক দিন খেতে না দেয়ার পর ডাক্তার যখন দেখলেন, মুজাহিদদের শিরা একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, শরীরের স্পন্দনও মনে হয় থেমে যাচ্ছে, সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তখন তিনি সম্রাটের নিকট খবর পাঠালেন যে, এ মুহূর্তে যদি তাদেরকে খাবার না দেয়া হয় তবে তাদের জীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

খবর পেয়ে সম্রাট নির্দেশ দিলেন, ওদেরকে শুকরের গোশ্‌ত ও মদ মিশ্রিত পানি খেতে দাও। আর স্পষ্ট বলে দাও যে, এটা শুকরের গোশ্‌ত আর এটা মদ মিশানো পানি। যদি বাঁচতে চাও তবে এগুলোই তোমাদের খেতে হবে। এ ছাড়া তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা নেই।

সম্রাটের কথামত যখন বন্দী মুসলমানদের সামনে এ সব হারাম ও নাপাক খাবার পরিবেশন করা হল এবং সবকিছু পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হল, তখন দলপতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) এক মুহূর্তও দেরী না করে চোখ রাঙ্গিয়ে হুংকার ছেড়ে বললেন, এক্ষুণিই এগুলো সামনে থেকে সরিয়ে নাও। যদি বিন্দুমাত্রও সময় নষ্ট কর তাহলে লাথি মেরে থালা-বাসন ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবো।

অবস্থা দৃষ্টে কারারক্ষীরা হতবাক হলো। তারা ভাবলো, একটু পূর্বেও যারা ক্ষুধার যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল; খাবার পরিবশন করার পর খাবার তো খেলই না বরং কত কঠিন কথা তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত হল! এ তো এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার!!

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা পাঠক ভাই-বোনদের জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, জান বাঁচানোর জন্য যদিও হারাম খাওয়া জায়েয তথাপি যদি অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, হারাম খাবার ভক্ষণ করলে ইসলামের শান-শওকত ও মর্যাদা ভূলণ্ঠিত হবে, ক্ষুন্ন হবে; তখন যদি হারাম না খেয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে উঁচু পর্যায়ের শহীদ বলে গণ্য হবে। (ফতওয়ায়ে শামী)

যা হোক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) এর কথা সম্রাটের কানে পৌঁছলে সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এবং তাদেরকে চূড়ান্ত পরীক্ষা করার কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

অহংকারী সম্রাট তার অনুচরদের নির্দেশ দিল, বন্দী মুসলমানদের প্রত্যেকের জন্য এতবড় একটি ডেগ তৈরী কর যাতে সম্পূর্ণ মানুষটি তাতে ডুবে যায়। অতঃপর ডেগগুলো তৈল দ্বারা ভর্তি করে ফুটাতে থাক। সম্রাটের আদেশ অনুসারে বিশাল বিশাল ডেগ তৈরী করা হল এবং এগুলো বড় বড় চুলার উপর

বসিয়ে তৈল দ্বারা পূর্ণ করে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বাল দেয়া হলো। এসময় সম্রাট মন্ত্রীদের নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো।

তেল যখন টগবগ করে ফুটতে শুরু করল তখন সম্রাট জল্লাদকে নির্দেশ দিয়ে বললো, মুজাহিদদের দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) ছাড়া অন্য যে কোন একজন মুসলিম বন্দীকে এই ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ কর।

নিষ্ঠুর জল্লাদ তাই করল। যখন একজন সাহাবীকে উত্তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলা হল, তখন মুহূর্তের মধ্যে তার সমস্ত দেহ মাছের ন্যায় ভাজা হয়ে গেল। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শহীদদের তালিকায় নাম লিপিবদ্ধ করলেন। বিদায় নিলেন এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরকালের মত। এবার আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) এর পালা। সম্রাট তাকেও ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করার জন্য জল্লাদকে নির্মম নির্দেশ দিল।

জল্লাদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) কে ধরে ডেগের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই নীরব, নিস্তব্ধ। কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলেই পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দলপতির মুখের দিকে। ভাবছে, তাকেও পূর্বের লোকটির ন্যায় একই ভাগ্যবরণ করতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) ধীরপদে সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। তার চেহারায় কোন ভয়ের ছাপ নেই, নেই হীম-শীতল মৃত্যুর ভয়াল বিভীষিকার আতংকে কোন বিষন্নতা। তবে বাহ্যত কিছুটা বিচলিত হওয়ার ক্ষীণতম লক্ষণ তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কারণ তার দু'গন্ড বেয়ে তখন ফোটা ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। সম্রাট মনে করলো, তিনি ভয় পেয়েছেন। তাই তাকে ফিরিয়ে এনে ডেকে বললো, দেখ, তুমি আমার হাতে বন্দী। তোমার মনে আছে যে, প্রথম দিন আমি তোমাকে বলেছিলাম, যদি তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে আমার রাজত্বের অর্ধেক তোমার নামে লিখে দিব, আমার কন্যাকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। আর আমি মারা যাওয়ার পর বাকী অর্ধেক রাজত্বের মালিকও তুমিই হবে। আমার সে প্রস্তাব এখনও বলবৎ আছে। যদি আমরা প্রস্তাব না মেনে এবার টু শব্দটি পর্যন্ত কর তাহলে

তোমার সাথীকে যেভাবে ফুটন্ত তেলে নিক্ষেপ করে জীবন লীলা সাঙ্গ করা হয়েছে তোমার অবস্থাও তা-ই হবে।

এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত হুযাইফা (রা.) এর ধৈর্যের সবগুলো বাধ যেন এক সঙ্গে ভেঙ্গে গেল। তিনি ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, হে বোকা সম্রাট! তুমি মনে করেছ মৃত্যুর ভয়ে আমি চোখের পানি ঝরাচ্ছি? মৃত্যুর ভয়ে নয়, বরং আমি তো চোখের পানি ফেলে খোদার দরবারে আফসোস করে বলছিলাম, হে পরওয়ারদিগার! তুমি তো আমাকে একটি মাত্র জীবন দিয়ে পরীক্ষা করছ। অথচ একটি মাত্র জীবন দিয়ে আমি কিভাবে তোমাকে বুঝাব যে, আমি তোমাকে কত ভালবাসি? তোমার দ্বীনকে কত ভালবাসি? যদি তুমি আমাকে একশ জীবন দিতে তাহলে এক একটি করে সবগুলো জীবনকে তোমার পথে বিলীন করে দিয়ে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম যে, আমি তোমাকে এবং তোমার দ্বীনকে কত ভালবাসি।

তার কথা শুনে সম্রাট ঘাবড়ে গেল। সে ভাবলো, এরা মানুষ নয়, দেবতা বা অন্য কিছু হবে। এদের মারলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে না। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এদেরকে মুক্তি দিয়ে বিদায় করতে পারলেই যেন তার জীবন বাঁচে। অবশেষে সে সাহাবীদেরকে মুক্তি দিল। শুধু মুক্তিই নয়, তাদের প্রত্যেককে মদীনা পর্যন্ত পৌঁছার ব্যবস্থাও করল।

এ সংবাদ মদীনায় পৌঁছলে স্বয়ং হযরত উমর (রা.) সহ সকল মুসলমান মদীনার বাইরে এসে তাদের সংবর্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাইফা (রা.) তার সঙ্গী-সাথীসহ সেখানে পৌঁছার পর উষ্ণ অভ্যর্থনা দিয়ে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এ ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা নিতে পারি যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম ঈমানের অগ্নি পরীক্ষায় যেরূপ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অনুরূপ কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমরাও যেন তাদের মত উত্তীর্ণ হই। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। ❐

(সূত্র ঃ সত্যের পথে সংগ্রাম পৃঃ ২৫)

দাম্ভিকতার করুণ পরিণতি

১৯৯৯ সাল। মানিকগঞ্জ শহরের উপকণ্ঠে ঘটে যায় একটি হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী ঘটনা। অহংকার ও দাম্ভিকতাকে যে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না এবং খোদায়ী বিধানকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে যে দুনিয়াতেও অনেক সময় মারাত্মক পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়-এ ঘটনাটি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

সেদিন ছিল রবিবার। তারাবীহের নামায আদায় করে দারুল উলূম দত্তপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহসিনুল করীমের কামরায় বসে তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ করছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে কথা প্রসঙ্গে তিনি আমার নিকট একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। বেদনাদায়ক ও লোমহর্ষক এ ঘটনা শ্রবণ করে সত্যিই আমি তন্ময় হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, শিক্ষা গ্রহণের জন্য এটি একটি সুন্দর ঘটনা। তাই সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের জন্য ঘটনাটি গ্রন্থবদ্ধ করলাম।

তখন বেলা আনুমানিক সাড়ে ৪টা হবে। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য অস্ত যাবে। ৪তলা একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে কন্ট্রাক্টর সাহেবের উপস্থিতিতে রাজমিস্ত্রীরা দ্রুতই কাজ করছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ২/৪ দিনের মধ্যেই অবশিষ্ট কাজ সমাধা করে ফেলা।

এদিকে বিল্ডিংয়ের নিকটবর্তী জামে মসজিদে আজ ২দিন হল তাবলীগ জামাত এসেছে। তাদেরই ১০/১২ জন উমুমী গাস্তে বের হয়েছে। গাস্তের এই জামাতে এলাকারও কয়েকজন সাথী শরীক হয়েছেন। রাহবর (পথ প্রদর্শক) ছিলেন এলাকার একজন ক্ষুদে ব্যবসায়ী। তিনি জামাতকে বিভিন্ন দোকান ও বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আর মুতাকাল্লিম ভাই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলে লোকজনকে মসজিদে যাওয়ার এবং বয়ান শুনার দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তার মূল বক্তব্য ছিল, আল্লাহর হুকুম মানা এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকায় চলার মধ্যেই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ রয়েছে। এ দুনিয়া মানুষের চিরস্থায়ী আবাসস্থল নয়। তাকে এখান থেকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক একদিন চলে যেতেই হবে। হাশরের ময়দানে মহান রাব্বুল আলামীন

আল্লাহ তায়ালার সামনে দন্ডায়মান হয়ে সারা জীবনের হিসাব অবশ্যই দিতে হবে।

যা হোক, এক পর্যায়ে রাহবর জামাতকে নিয়ে পূর্বোক্ত বিল্ডিংয়ের নীচ তলায় গেলে সেখানে উপস্থিত একজন লোক বলল, হুজুর! রাজমিস্ত্রীরা সবাই ছাদে কাজ করছে। সেখানে কন্ট্রাক্টর সাহেবও আছেন। আপনারা যদি কষ্ট করে সেখানে চলে যান তাহলে অনেক লোককে এক সাথে দাওয়াত দিতে পারবেন।

একথা শুনে রাহবর আমীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলেন। তাদেরকে দেখে রাজমিস্ত্রীরা কাজ বন্ধ করে দিলেন।একত্রে জমায়েত হলেন এবং সালাম-মোসাফাহার পর্ব শেষ করে মুতাকাল্লিমের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন।

এদিকে কন্ট্রাক্টর সাহেবের এসব মোটেও বরদাশ্‌ত হচ্ছিল না। তার চেহারায় কেবল বিরক্তিই নয় বরং ঘৃণার ছাপও স্পষ্ট পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আলেম-ওলামা আর ধর্মীয় কথাবার্তা তার কাছে একেবারেই অসহ্য।

রাজমিস্ত্রীদেরকে কিছু কথাবার্তা বলে মসজিদে যাওয়ার দাওয়াত দেওয়ার পর মুতাকাল্লিম কন্ট্রাক্টরকেও লক্ষ্য করে দু'চারটি কথা বললেন এবং মসজিদে যাওয়ার আহবান জানালেন। কিন্তু চরম অহংকারী কন্ট্রাক্টর তার কথায় মোটেও কর্ণপাত করলো না। বরং উল্টো বলতে লাগলো, আরে যান যান! মোল্লা-মৌলভী আর তাবলীগ ওয়ালাদের কথা আর কি শুনব। এগুলো আমি নিজেই অনেক জানি। নামায রোজা আর জিকির তিলাওয়াত তো বুড়োদের কাজ। আমাদের এখনো ইবাদতের সময় হয়নি। সবে মাত্র বিয়ে-শাদী করেছি। বাচ্চা-কাচ্চা হবে, দাড়ি পাকবে, জীবনটাকে আচ্ছামত ভোগ করবো, এরপর নামায রোজার ব্যাপারে না হয় চিন্তা ভাবনা করা যাবে। এখন আমাদের আনন্দের সময়। মন মতো খাব, ঘোরা-ফেরা করব, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকবো এটাইতো আমাদের বর্তমান বয়সের চাহিদা। অযথা আমাকে বিরক্ত করবেন না। এখন আপনারা যেতে পারেন।

কন্ট্রাক্টরের বক্তব্যের পর জামাতের জিম্মাদার সাহেব তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে তো বুঝলোই না বরং উল্টো বিভিন্ন প্রকার কটুক্তি করতে লাগলো। ভাবখানা এমন যে, সে যেন পারলে জামাতের লোকগুলোকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়। শেষ পর্যন্ত জামাতের লোকজন নিরাশ হয়ে বুকভরা ব্যাথা নিয়ে নীচে নামতে লাগলো। কন্ট্রাক্টরের উদ্ধতপূর্ণ আচরণ ও অভদ্র ব্যবহারে তারা এতই কষ্ট পেলেন যে, তাদের প্রত্যেকের নেত্রকোনে পানি জমে গেল। কারো কারো দু'এক ফোটা অশ্রু গন্ড বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু স্রষ্টার খেলা বুঝা বড় দায়! তাদের এখনো নীচে নামা শেষ হয়নি। একটি বিকট চিৎকারের আওয়াজে সকলেই থমকে দাঁড়ালেন। পরে তারা খুঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, একটু পূর্বে যে অহংকারী কন্ট্রাক্টর জামাতের লোকদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে বলেছিল, তার এখানো ইবাদতের সময় হয়নি, যিনি ছিলেন দীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশায় বিভোর, যিনি ছিলেন অন্ধ অহমিকায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সেই তিনিই ছাদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার সময় পা পিছলে পড়ে গেছে। শুধু পড়ে গেছে বললে বোধ হয় কথাটা ভুল হবে। কারণ ৪তলার ছাদ থেকে নীচে পড়ার সময় পাশের বিল্ডিংয়ের অসংখ্য ধারালো রডের আঘাতে তার দেহের অধিকাংশ গোশ্ত ও নাড়ি-ভূড়ি সেখানেই আটকে রয়েছে। চোখ দুটো বের হয়ে গেছে। মস্তিষ্ক ছিটকে পড়েছে। দেহের হাড্ডিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। চেহারা থেথলে গেছে। ফলে লাশটি এমন এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে যে, এই বীভৎস লাশ যে কেউ দেখবে, সে কিছুতেই চমকে না উঠে পারবে না।

উপরোক্ত বাস্তব ঘটনা থেকে আমরা কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

(এক) যাদের বয়স কম তাদের এ কথা ভেবে ইবাদত থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই যে, জীবনের তো আরও অনেক অংশ বাকী আছে। তখন নামায-রোজা, জিকির-আযকার, দান-খয়রাত বেশী পরিমাণে করে নিব। কারণ কার কখন মৃত্যু আসে

বলা যায় না। তাই সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে নিজের জীবনের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য তৈরী গ্রহণ করে। আর নির্বোধ হল ঐ ব্যক্তি, যে (একদিকে) আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, (আবার অন্য দিকে) আল্লাহর নিকট(ক্ষমা প্রাপ্তির) আশাও পোষণ করে। (তিরমিযি)

(দুই) আলেম-উলামা, তাবলীগ কিংবা দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত যে কোন লোককে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য বা হেয় প্রতিপন্ন করলে এর মারাত্মক ও করুণ পরিণতি আল্লাহ তায়ালা অনেক সময় দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেন। আর আখেরাতের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তো আছেই।

(তিন) নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা যাবে না। সব সময় অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে। যদি কোন সময় নিজেকে বাহ্যত অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় তাহলে একথা ভেবে তাকেই নিজের চেয়ে ভাল মনে করতে হবে যে, সে হয়তো গোপনে এমন কোন আমল করে যদ্বারা আমার তুলনায় সে আল্লাহর বেশী প্রিয় পাত্র হয়ে গেছে বা হয়ে যাবে।

মোট কথা, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা অহংকার মোটেও পছন্দ করেন না। তাই সকলকে এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তুমি আমার জমীনে উদ্ধত আর অহংকার ভাব নিয়ে হাটাহাটি করো না। (মনে রেখো, শক্ত পদাঘাতের মাধ্যমে) তুমি আমার জমীনকে ফাটাতে পারবে না এবং (অহংকারী মস্তককে উচুঁ করতে করতে) পাহাড় চূড়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না।" (বনী ইসরাঈসঃ ৩৭)

এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালা (প্রতিদান স্বরূপ) তার মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দেন।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে উল্লেখিত ঘটনার শিক্ষণীয় বিষয়গুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তদানুযায়ী জীবন গঠন করার তৌফিক নসীব করুন। আমীন॥ ❐

এমন ঈমানই অর্জন করা চাই

রায্যাক। আল্লাহ তায়ালার একটি গুণবাচক নাম। যার অর্থ-রিযিক দাতা। অনুরূপভাবে তার আরেকটি গুণবাচক নাম হল, রব।

রব মানে প্রতিপালক, পালনে ওয়ালা, পালনকর্তা। রব শব্দের অর্থটুকু ব্যাখ্যা করে বললে এভাবে বলতে হয় যে, যিনি সকল প্রাণীকে শৈশব থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল উপকরণাদি সরবরাহ করে লালন পালন করেন তিনিই হলেন রব।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের রব, একথা শুধু মুখে বললেই চলবে না বরং মনে-প্রাণে, অন্তর দিয়েও তা বিশ্বাস করতে হবে। অন্তরে এরূপ বিশ্বাস রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। অন্যথায় পারলৌকিক জীবনে তাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। এটি কোন মামুলি বা সাধারণ ব্যাপার নয়। আর সাধারণ ব্যাপার নয় বলেই তো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাযের মধ্যে বারবার রবের মশ্ক করানো হয়, ট্রেনিং দেয়া হয়। যেমন, আমরা ক্বেরাতের শুরুতেই বলি, আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, পালনেওয়ালা। অনুরূপভাবে রুকু ও সিজদায় বলি, সুবহানা রাব্বিয়াল আজীম, সুবহানা রব্বিয়াল আলা। অর্থাৎ আমার মহান প্রতিপালক, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র।

মৃত্যুর পর মানুষকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন সর্বপ্রথম ফেরেশ্তারা তাকে রব সম্পর্কেই প্রশ্ন করে। তারা বলে, মার্রাব্বুকা। অর্থাৎ তোমার পালনেওয়ালা কে? যদি ঐ ব্যক্তি মেহনত করে তার অন্তরে এ কথার বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে যে, আল্লাহই আমার পালনেওয়ালা তাহলে ফেরেশতাদের প্রশ্নের সাথে সাথে সে জবাবে বলে, রাব্বিয়াল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহই আমার পালনেওয়ালা। পক্ষান্তরে সে যদি অনুরূপ একিন ও বিশ্বাস না নিয়ে মারা যায়, তাহলে জবাবে সে বলবে,

'লা আদ্‌রী' অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না। বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত আলোচনা দ্বারা তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শুধু তাই নয়। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির পূর্বে আমাদের সকল রুহকে একত্রিত করে প্রশ্ন করেছিলেন, আলাস্‌তু বিরাব্বিকুম? অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভূ নই? তখন কিন্তু সকলেই একবাক্যে জবাব দিয়েছিলাম, হ্যাঁ, আপনিই আমাদের রব, আপনিই আমাদের প্রতিপালক। কিন্তু দুনিয়ায় এসে এ কথার উপর মেহনত করে এ প্রতিশ্রুতি ধরে না রাখার কারণে আমাদের অনেকের বিশ্বাসই নড়বড়ে হয়ে গেছে। ফলে কেউ মনে করি, চাকুরী আমাকে পালে। কেউ মনে করি, ব্যবসা আমাকে পালে। কেউ মনে করি, ক্ষেত-খামার আমাকে পালে। মোট কথা, যে যেখান থেকে বাহ্যত তার রিযিকের ব্যবস্থা দেখছে সে তাকেই রব বা পালনকর্তা মনে করছে। (নাউযুবিল্লাহ)

উপরোক্ত আলোচনা পাঠ করে অনেকেই হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে, আমার ঈমান ঠিক আছে। কারণ আমি তো আল্লাহ তায়ালাকেই রব বলে স্বীকার করি। ব্যবসা, চাকুরী, ক্ষেত-খামার, গাড়ী, ইন্ডাষ্ট্রিজ ইত্যাদি দুনিয়ার কোন আসবাবকে রব মনে করি না। কিন্তু এ কথাটি আপনি কতটুকু মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন তা তখনই বুঝা যাবে যখন বাস্তব ক্ষেত্রে আপনি পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি পরীক্ষা এমন হতে পারে যে, যদি আপনাকে বলা হয়, জনাব! আপনি ৪ মাসের জন্য তাবলীগে চলে যান। তখন যদি আপনার মধ্যে এ প্রশ্ন জাগে যে, আমি চলে গেলে আমার ছেলে মেয়েকে কে পালবে? আমার ব্যবসার কি হবে? অথবা আব্বা তাবলীগে চলে গেলে আমাদেরকে খাওয়াবে ইত্যাদি প্রশ্ন মনে এসে ভীড় জমায় তাহলে বুঝতে হবে, আমার ঈমান মজবুত হয়নি। আমি যে বলি, 'আল্লাহ আমার রব' এটা কেবল আমার মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়।

মোট কথা, অন্তরের বিশ্বাসই আসল। আর অন্তরে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানোর জন্য মেহনত প্রয়োজন। অর্থাৎ বারবার একথা শুনতে হবে এবং মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে যে, আল্লাহই আমাদের পালনেওয়ালা। দুনিয়ার কোন আসবাব আমাকে পালে

না, পালতে পারে না। যারা এরূপ ঈমান নিয়ে মরতে পারবে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক এবং মৃত্যু পর্যন্ত এ কথার উপর অটল থাকে, তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলতে থাকে তোমরা ভয় পেয়ো না এবং চিন্তিত হইও না। তোমরা এমন জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু ছিলাম। আখেরাতেও আমরা তোমাদের বন্ধু থাকবো। সেখানে তোমাদের জন্য তাই আছে যা তোমাদের মনে চায় এবং যা তোমরা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল মহান করুণাময় আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।" (সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ ৩০-৩২)

এবার এ সম্পর্কীয় একটি ঘটনা শুনি।

জনৈক মহিলার স্বামী চার মাসের জন্য তাবলীগে যাওয়ার নিয়ত করেছেন। অল্প ক'দিন পরেই তিনি বের হয়ে যাবেন। একথা জানাজানি হয়ে গেলে কয়েকজন লোক এসে ঐ মহিলাকে সম্বোধন করে বললো, আমরা শুনতে পেরেছি যে, তোমার স্বামী নাকি কয়েক দিনের মধ্যে ৪ মাসের জন্য জামাতে চলে যাবে। একথা কি ঠিক?

মহিলা জবাবে বললো, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক।

ঃ তুমি কি এতে রাজি আছ?

ঃ অবশ্যই রাজি আছি।

ঃ তুমি কি একটু চিন্তা করে দেখেছ যে, তোমার স্বামী দীর্ঘ সময়ের জন্য জামাতে চলে গেলে তোমাদের কি অবস্থা হবে? তোমরা কি বেওকুফ হয়ে গেলে? তিনি চলে গেলে কে তোমাদের খাওয়াবে? কে তোমাদের দেখাশুনা করবে। কে তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের ব্যবস্থা করে দিবে? তোমরা কি কিছুই বুঝ না?

ঃ জ্বী, সবই বুঝি? বুঝি বলেই তো রাজি হয়েছি?

ঃ বুঝলে এতবড় একটা কান্ডজ্ঞানহীন কাজ করার জন্য

কিভাবে রাজি হলে? এটা তো কিছুতেই আমাদের মাথায় ধরছে না যে, তোমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি হলেন তোমার স্বামী। তিনি চলে গেলে কিভাবে তোমাদের সংসার চলবে?

তাদের এ প্রশ্নের জবাবে মহিলা যে জবাব দিয়েছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, আমার তো মনে হয় এটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো জবাব। 'আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা'এ কথার একীন অন্তরে বসানোর জন্য এরূপ একটি কথাই যথেষ্ঠ।

মহিলা বললো, আমাদের পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা ছয়জন। আমার স্বামী হলেন ছয় জনের একজন। তিনি জামাতে চলে গেলে সদস্য হবে পাঁচ জন। আর পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে গেলে কেহই চিন্তিত হয় না, বরং খুশিই হয়। কারণ তাকে কেন্দ্র করে যে টাকা-পয়সা খরচ হত সে খরচটুকু এখন কম লাগবে। আর আমি আমার স্বামীকে কখনোই রিযিকদাতা মনে করিনি। এখনো করি না। বরং আমি তাকে আহারকারীদেরই একজন মনে করি।

আমি যাকে রিযিকদাতা হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি তিনি হলেন আমার প্রতিপালক-আল্লাহ তায়ালা। তিনি আগেও ছিলেন, এখনো আছেন এবং আমার স্বামী জামাতে চলে যাওয়ার পরও থাকবেন। সুতরাং আমার চিন্তার কোন কারণ নেই। যদি আমি স্বামীকে রিযিকদাতা মনে করতাম তাহলে তিনি চলে গেলে আমি চিন্তিত হতাম। একথা ভেবে যে, তিনি চলে গেলে কে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন? কে আমাদের লালন-পালন করবেন? আমি যাকে লালন-পালনকারী মনে করি তিনি যেহেতু আছেন সেহেতু আমার কোন ভয় নেই। কোন চিন্তা নেই।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ পাকের রায্যাকিয়্যাতের উপর আমাদের বিশ্বাস কি উক্ত মহিলার মত মজবুত? আমাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিটি মৃত্যুবরণ করলে কিংবা দীর্ঘ দিনের জন্য জামাতে বা অন্য কোথাও চলে গেলে কি আমাদের মনের অবস্থা ঐ মহিলাটির মত

থাকবে? আমরা কি তখন বলতে পারবো যে, তিনি চলে যাচ্ছেন তাতে কি? আমাদের রিযিকদাতা আল্লাহ তো আছেন। তিনি যে কোন উপায়ে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পুরা করবেন।

যদি এ প্রশ্নের জবাব 'না' হয় তাহলে বুঝতে হবে আমার ঈমান এখনো পূর্ণ হয়নি। আরও মেহনত করে আমাকে এরূপ মজবুত ঈমান অর্জন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা এই যে, অনেকে এ ভয়ে ২/৩টির বেশী বাচ্চা নিতে চায় না যে, ছেলে মেয়ে বেশী হলে তাদের ভরণ পোষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

তাদের এরূপ চিন্তা-ভাবনার অর্থ কি এই নয় যে, তারাই হলেন ছেলে-মেয়েদের রিযিক দাতা ও লালন-পালনকারী? (নাউযুবিল্লাহ) অথচ আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন- "তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তোমাদের এবং তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা জঘন্য অপরাধ।" (সূরা বনী ঈসরাইল ঃ ৩১)

সুতরাং যারা উপরোক্ত আক্বীদা-বিশ্বাস নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে সন্তান নেয়া থেকে বিরত থাকছেন বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন পদ্ধতি অবলম্বন করছেন তারা অবশ্যই মহাপাপে লিপ্ত রয়েছেন। আল্লাহ সবাইকে হেফাযত করুন।

অবশ্য কেউ যদি শরয়ী কোন ওজর যেমন মুসলমান দ্বীনদার ডাক্তারের মতে, যদি দুর্বল মহিলার গর্ভধারণে মৃত্যুর আশংকা কিংবা স্বাস্থ্য বেশী খারাপ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে কিংবা এ মুহূর্তে সন্তান নিলে সন্তানের শারীরিক বিরাট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং উপরোক্ত বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও না থাকে তাহলে তখন সাময়িকভাবে গর্ভরোধ করা জায়িয হবে। কিন্তু তা এমনভাবে করতে হবে, যাতে হারাম কাজের আশ্রয় নিতে না হয়। সবচেয়ে উত্তম হল, হক্বানী কোন আলেমের সাথে পরামর্শ করে এব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। ❐

ঈমান যার হিমালয়কেও হার মানায়

'কোন কালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী,
শক্তি দিয়েছে প্রেরণা দিয়েছে বিজয় লক্ষী নারী।'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এ পংক্তিটি ধ্রুব সত্য। এতে মোটেও সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা, বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত প্রতিটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানেই নারীরা ছিল পুরুষের প্রেরণার উৎস।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের মেয়েদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা আপন স্বামীকে নিজ হাতে সাজিয়ে জেহাদের ময়দানে পাঠাতেন। নিজের সন্তানকে তলোয়ার ও খুনের মাঝে দাঁড় করানো তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল। কলিজার টুকরো সন্তান শহীদ হয়ে গেলেও তাদের আঁখি যুগল বেদনার অশ্রুতে ভিজে উঠতো না। স্বামী, ভাই কিংবা অন্য কোন একান্ত আপনজন আল্লাহর পথে কুরবান হয়ে গেলেও তারা এতটুকু দুঃখ অনুভব করতেন না। বরং উল্টো গর্বই বোধ করতেন।

যে সকল মহিয়সী মহিলা কখনোই অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি, যাদের ঈমান ছিল পাহাড়সম অটল অবিচল, যাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ ও দুর্জয় ইসলামী চেতনার সামনে কোন ঘৃণ্য অপচেষ্টাই টিকতে পারেনি-তাদেরই একজনের বীরত্বপূর্ণ লোমহর্ষক কাহিনী পাঠক ভাই-বোনদের সামনে তুলে ধরছি।

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী রাবেয়া বলখী বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। বয়স আনুমানিক ১৫/১৬ হবে। নাহিদ নামের এ মেয়েটির ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ায় স্বভাবতঃই সে একটু বেশী ধর্মভীরু ও নম্র প্রকৃতির ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে রূপ-সৌন্দর্যও দান করেছিলেন অন্য দশজনের চেয়ে বেশী। তাছাড়া মেধাবী ছাত্রী হিসেবেও তার সুনাম সারা শহরময় ছড়িয়ে পড়েছিল। পরিবেশ ও শিক্ষা-দীক্ষার গুণে তার মনে দেশ প্রেম ও ধর্ম সচেতনতা ছোট বেলা থেকেই শিকড় গেড়ে বসেছিল।

আফগানিস্তানে তখন কমিউনিষ্ট শাসন চলছে। মুক্ত স্বাধীন আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর আগ্রাসন ও খোদাদ্রোহী কমিউনিষ্টদের শাসন ক্ষমতা দখলে নাহিদের কোমল হৃদয় আহত হয়। কিন্তু সে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে তার মনোভাব চেপে যেতে থাকে।

নাহিদের পিতার নাম ফরিদ খান। সে ছিল কাবুলের কমিউনিষ্ট পার্টির একজন উচুঁ দরের পান্ডা। চরম ইসলাম বিদ্বেষী এ লোকটি কখনোই নাহিদের ধর্মভীরুতাকে পছন্দ করতো না। অন্যান্য প্রগতিবাদী নাস্তিকদের ন্যায় পর্দার বিধানকে সে শুধু অপ্রয়োজনীয়ই মনে করতো না, উপহাসও করতো। সে মনে করতো, দেড় হাজার বছরের পুরানো ইসলাম বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে কিছুতেই চলতে পারে না।

নাহিদের বাড়ীতে প্রায়ই সোভিয়েত সেনা অফিসাররা বেড়াতে আসতো। কিন্তু সে সব সময় তাদেরকে এড়িয়ে চলতো। কখনোই তাদের সামনে আসতো না। একদিন জনৈক রুশ কর্মকর্তা নাহিদকে দেখে ফেলে। সাথে সাথে তার চোখে-মুখে কামনার আগুন জ্বলে উঠে। ভাবে, এমন সুন্দরী নারীতো জীবনে দেখিনি। আহা! যদি একটি বার .....।

রুশ কর্মকর্তা তার নাপাক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য ফন্দি আটতে থাকে। এ সময় নাহিদের পিতা ঘরে প্রবেশ করলে সে বলে, তোমার মেয়ের নাচ দেখতে হবে। এ খুবসূরত কন্যাকে ঘরে লুকিয়ে রেখে তুমি তো আমাদের সাথে চরম বেঈমানী করেছ। তাকে তো আরও আগেই তোমার ক্লাবে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

আত্মসম্ভ্রমবোধহীন কমিউনিষ্ট নেতা ফরিদ খানের পক্ষে এ প্রস্তাব গ্রহণ করা মোটেও কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু সে ভাল করেই জানে যে, নাহিদকে কোন ক্রমেই ক্লাবে নিয়ে নাচানো যাবে না। তাই নরম স্বরে সে বললো, নাহিদ খুব লাজুক মেয়ে। ক্লাবে গিয়ে সে নাচতে রাজী হবে না।

একথা শুনে নারী লিপ্সু রুশ কর্মকর্তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে বললো,

ঃ তুমি না কমিউনিষ্ট?

ঃ জ্বি, অবশ্যই আমি কমিউনিষ্ট। দৃঢ় কণ্ঠে ফরিদ খান জবাব দিল।

ঃ না, তুমি কমিউনিষ্ট হতে পারোনি। কোন কমিউনিষ্টই এমন সেকেলে হতে পারে না। কোন কমিউনিষ্টের স্ত্রী-কন্যাই বিদ্রোহী মৌলবাদীদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না। আমাদের মেয়েরা তো স্বাচ্ছন্দে নেচে গেয়ে ক্লাবগুলোকে মাতিয়ে রাখে। যদি আসলেই তোমরা দেশের সত্যিকার উন্নতি চাও, তবে পাক্কা কমিউনিষ্ট হয়ে যাও। নিজেদের স্ত্রী-কন্যাকে তথাকথিত লজ্জা-শরমের শিকল থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার স্বাদ নিতে দাও। এজন্যেই তো আমরা এতদূর থেকে তোমাদের সহায়তায় ছুটে এসেছি।

রুশ কর্মকর্তার কথা শুনে ফরিদ খান খুবই লজ্জিত হলো। সে প্রতিজ্ঞা করলো, যেভাবেই হোক নাহিদকে সে ক্লাবে নিয়ে নাচাবেই।

রুশ কর্মকর্তা চলে যাওয়ার পর ফরিদ খান মেয়েকে বুঝাতে চেষ্টা করলো। সে অত্যন্ত নম্র কণ্ঠে বললো,

"মা! তুমি যদি ক্লাবে গিয়ে নাচ তাহলে আমার পদমর্যাদা বাড়বে। বৃদ্ধি পাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আমার সম্পর্কের সুফল। তদুপরি আমি পাক্কা কমিউনিষ্ট হিসেবেও নিজেকে প্রমাণিত করতে সক্ষম হবো।"

রুশদের গড়া ক্লাবগুলোতে সারারাত ব্যাপী কি অপকর্ম চলে তা নাহিদ ভাল করেই জানতো। সেখানে কিভাবে নারীর সতীত্বে আঘাত হানা হয় তাও তার অজানা ছিল না।

তাই পিতার কথা শুনে নাহিদের সমস্ত দেহে কম্পন শুরু হয়ে গেলো। এ মুহূর্তে সামনে দণ্ডায়মান পিতাকে সে একটি মানবরূপী পশু বলেই মনে করলো। মনে মনে বললো, ধিক! শতধিক!! সেই পিতাকে, যে নিজের ঔরশজাত কন্যার সম্ভ্রমকে কেবলই অপরেব অনুগ্রহ লাভের আশায় বিকিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠিত হয় না।

নাহিদ অত্যন্ত শান্ত অথচ কঠোর উচ্চারণে বাবাকে বলল.

পিতা হিসেবে আপনাকে আমি খুব ভালবাসি। শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলেই একজন খোদাদ্রোহী নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও আমি এখনো আপনার কাছে আছি। আমার ভাবতেও লজ্জা লাগে যে, একজন জন্মদাতা পিতা কিভাবে আপন মেয়ের ব্যাপারে এত আত্মমর্যাদাহীন হতে পারে! আপনি তো শুধু ইসলামই ত্যাগ করেননি বরং আমাদের দেশীয়-সামাজিক নিয়ম-নীতিগুলো পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন।

জবাবে ফরিদ খান বলে, শোন নাহিদ! তুমি বেশী উদ্ধত হয়ে যাচ্ছো। একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখো যে, ইসলাম একটি মধ্যযুগীয় আদর্শ। অনেক পুরোনো কিছু নীতিকথা। এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী সরলমনা জনগণকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে এসব বিধি নিষেধের জাল পেতেছে। দেড় হাজার বছর আগে এক সময় ইসলাম হয়তো আধুনিক একটা জীবনাদর্শ হিসেবে সফল হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে বর্তমান উন্নতি ও প্রগতির যুগে সেটিই আকড়ে ধরে রাখতে হবে কেন? এত বছরের পুরোনো একটি আদর্শকে এখনো আঁকড়ে থাকার কি অর্থ হতে পারে?

পিতার কথা শুনে নাহিদের চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ফরিদ খান একটু সময় নিয়ে আবার বলতে থাকে, নাহিদ! তুমি কি কখনো চিন্তা করে দেখেছ, লজ্জা-শরম ও শালীনতার দোহাই দিয়ে আফগান নারীদেরকে কতটুকু পিছিয়ে রাখা হয়েছে? আমেরিকান নারীদের অবস্থাই চিন্তা কর। তারা সেখানে কতটা স্বাধীন। মুক্ত বিহংগের মতো তারা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যবসা বাণিজ্য করছে; পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে; সভা সমিতিতে অবাধে যাতায়াত করছে। অথচ এদেশে মোল্লা-মৌলভীরা ইসলামের নামে নারী সমাজকে চার দেয়ালে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তুমি যদি নিজেকে সময়ের সাথে পরিচালিত করতে না পার; তাহলে অনেক পিছনে পড়ে যাবে। আমি চাই তুমি সামাজিক হও। তুমি যতটুকু সুন্দরী সে পরিমাণ সামাজিকতা যদি তোমার মাঝে সৃষ্টি হয় তাহলে তোমার পিতার সম্মানই শুধু বৃদ্ধি পাবে না, তোমার জীবনেরও একটা উত্তম ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মনের মতো সঙ্গী পাবে তুমি। বড় বড় সোভিয়েত কর্মকর্তারাও তোমাকে বিয়ে করার জন্য ঘুর ঘুর করবে।

পিতার আত্মমর্যাদা ও সামাজিক মূল্যবোধ বলতে আর কিছুই যে অবশিষ্ট নেই, এ বিষয়টি এত স্পষ্ট ভাবে আর কখনো নাহিদের কাছে ধরা পড়েনি। নিজের কোমল হৃদয়ে সীমাহীন আঘাত পেয়েও নাহিদ খুবই শান্ত হয়ে বললোঃ

আপনি যে জীবনাদর্শকে মধ্য যুগীয় ও প্রাচীন বলেছেন, সে জীবনাদর্শই নারী জাতিকে ঐ মর্যাদা দিয়েছে যা আমেরিকা আর রাশিয়াও দিতে পারেনি। ইসলাম নারীকে যে সম্মান দিয়েছে দুনিয়ার অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদ কি তা দিতে পেরেছে? আপনার বক্তব্য শুনে আপনাকে আব্বা বলে ডাকতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি নিজের দ্বীন ও ঈমান বিক্রি করেছেন। আপন প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা বেচে দিয়েছেন। এখন নিজের কন্যার মান-ইজ্জতও বিকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন। আপনি কি চান যে, আপনার আদরের কন্যা নাস্তিক কাফির আর বেঈমানদের সামনে নৃত্য করুক। তাদের কাছে আমার বহু দিনের সযত্নে লালিত সম্ভ্রম ভূলুণ্ঠিত হউক, তারা আমাকে ভোগপণ্য রূপে ব্যবহার করুক? এসব তো আমি কোন মুসলমানের সামনেও করতে রাযী নই। আপনি এখন আর আমার পিতা হওয়ার যোগ্য নন। আপনি এখন ঈমান বিক্রেতা এবং দেশের স্বাধীনতা ও আপন কন্যা সন্তানের সম্ভ্রমের সওদাগর।

জওয়াব শুনে ফরিদ খানের চিন্তা আরোও বেড়ে গেল। ভাবল, তাহলে কি আমি মেয়ের নিকট পরাজিত হব? না, তা কিছুতেই হতে পারে না। তাই সে অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে বললোঃ

তোমার ধর্ম তোমাকে কি এ শিক্ষাই দিয়েছে যে, নিজের পিতার সাথে এমন বেয়াদবীর স্বরে কথা বলবে? যিনি সর্বদা তোমার উন্নতি ও সুখের কথাই ভেবে থাকে!

হ্যাঁ, আমার ধর্ম আমাকে এ শিক্ষাই দেয় যে, নিজের জন্মদাতা পিতাও যদি ইসলাম বিদ্বেষী খোদাবিমুখ মুরতাদ হয়ে যায়, তবে তার পিতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সেদিন ফরিদ খান আর কথা না বাড়ালেও পরবর্তীতে নাহিদকে ক্লাবে নেয়ার জন্য অনেক বুঝিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেছে। কোন তদবীরই সে বাকী রাখেনি। রাগ করেছে, ধমক

দিয়েছে, বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে কিন্তু নাহিদ কিছুতেই রাযী হয়নি।

শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে পশুতুল্য এই পিতা জোর করে নাহিদকে ক্লাবে নিয়ে যায় এবং রুশ অফিসারদের সাথে রেখে বাইরে চলে আসে।

নারী পাগল অফিসাররা নাহিদকে পেয়ে খুশিতে নেচে উঠে। ভাবে, এতদিনে ফরিদখান প্রকৃত কমিউনিষ্ট হতে পেরেছে। তারা প্রথমে নাহিদকে নাচতে বলে। অতঃপর ঢক্ ঢক্ করে মদপান করতে থাকে।

নাচার কথা শুনে নাহিদের সামনে পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে এলো। পায়ের নিচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। ক্রোধে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে গিয়ে তার মুখখানা রক্ত বর্ণ ধারণ করেছে। নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক অফিসার তাকে আবার নাচতে অনুরোধ করে।

এবার নাহিদ মুখ খুললো। সে স্পষ্ট ভাষায় বললো, আমি একজন মুসলমান নারী। আল্লাহর রাস্তায় আমার এ নগণ্য প্রাণটা দিয়ে দিতে পারি, কিন্তু তবু তোমাদের সামনে আমি নাচতে পারবো না।

তার কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে জনৈক রুশ অফিসার আহত বাঘের ন্যায় গর্জে উঠে বললো, ইসলাম তো আফগানিস্তান থেকে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। আর এ ক্লাবের জলসা ঘরে তোমার আল্লাহ আসবে না। নরম কথায় যদি তুমি রাজী না হও, তবে অন্য রাস্তাও আমাদের জানা আছে।

ঃ অফিসার! তুমি হয়তো ভুলে যাচ্ছো যে, আমি এক পাহাড়ী মেয়ে। সব ধরণের নিপীড়ন সওয়ার মতো মনোবল ও ধৈর্য আমার আছে।

ঃ নাহিদ! তোমার হয়তো জানা নেই যে, আমাদের হাতে এমন শক্তিশালী অস্ত্র রয়েছে যা বিশালকায় পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম।

ঃ আমার আল্লাহ তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। তার এক দুর্বল বান্দীকে কষ্ট দিতে যদি তোমাদের এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ আমাকে একটা মজবুত পাহাড়ের চেয়েও শক্ত ও কঠোর দেখতে পাবে।

পাষন্ড অফিসার নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্যাতনের পথই বেছে নিল। সে প্রথমে ক্লাবের সবাইকে বের করে দিল। অতঃপর মানবরূপী কাপুরুষ অফিসার সকল প্রকার মানবতা বিসর্জন দিয়ে দুর্বল এক কিশোরীর সাথে যে হৃদয়বিদারক, লোমহর্ষক ও নিষ্ঠুর আচরণ করলো, তা যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষের চোখ দু'টোকেও অশ্রুবন্যায় ভাসিয়ে দিবে। তার নির্মমতা ও নৃশংসতা যেন হিটলারী বর্বরতাকেও হার মানাবে।

নাহিদকে একা পেয়ে মদমত্ত অফিসার হিংস্র হায়েনায় পরিণত হলো। সে প্রথমে নাহিদের কাপড় খুলে তাকে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার প্রতিরোধের মুখে কিছুতেই সফল হতে পারলো না। অবশেষে মানবতার কলংক পশুরূপী এ অফিসার তার গায়ের সবগুলো কাপড়-চোপড় জোড় করে টেনে ছিঁড়ে ফেললো। তারপর তার গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের স্যাঁকা দিতে লাগলো।

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ স্যাঁকা দেওয়ার পর শুরু হল নির্যাতনের দ্বিতীয় পর্যায়। পাষন্ড লোকটি আরও কয়েকজনকে ডেকে তাদের সহযোগীতায় নাহিদকে ঘরের মেঝে শুইয়ে দিল। অতঃপর ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তার শরীরে নিজের অপবিত্র নাম লিখতে লাগলো।

এদিকে নাহিদ চরম ধৈর্যের সাথে চোখ বুঝে সকল নির্যাতন সহ্য করে যাচ্ছে। সে নীরব-নির্বিকার। উদাসী তার চাহনী। যেন জগতের কোন কিছুর প্রতি তার কোন খেয়াল নেই। তার কোমল দেহের সাথে কি পৈশাচিক বর্বরতা চলছে, সেদিকে যেন তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। হিংস্র হায়েনাদের ইবলিসী তান্ডবের ফলে তার দেহের প্রতিটি অংশ যে বিধ্বস্ত হচ্ছে, রক্তাক্ত হয়ে চলেছে দেহের বিভিন্ন অংশ, সেদিকেও বোধ হয় তার কোন খেয়াল নেই।

নাহিদের চোখে মুখে তখন দৃঢ়তার ছাপ। সে যেন তখন এমন এক শক্ত বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছে, যার সাথে ধাক্কা খেলে বিশালকায় পর্বত পর্যন্ত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

রাতভর নির্মম-নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক নির্যাতনের ফলে শেষ রাতের দিকে নাহিদ শহীদ হয়ে যায়। কিন্তু বেঈমান-কাফেররা তাকে নাচাতে পারেনি। পারেনি দুর্বল এক কিশোরীর সাথে বিজয়ী হতে। মৃত্যুর সময় নাহিদ দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে দুটো শ্লোগান তুলেছিল, 'আল্লাহু আকবার' আফগানিস্তান জিন্দাবাদ।' এই ছিল নাহিদের শেষ কথা।

শহীদ হওয়ার পরও বর্বর রুশীয়রা নাহিদের গায়ের উপর কোন কাপড় দেয়নি। তার এই অনাবৃত দেহটিকে তারা একটি মসজিদের চত্বরে ফেলে রাখে। ফজরের সময় মুসুল্লীরা লাশটি দেখতে পেলে গোটা এলাকা জুড়ে শোক ও দুঃখের ছায়া নেমে আসে। নাহিদের স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীরা সংবাদ পেয়ে সেখানে দ্রুত সমবেত হয়। লাশ ছুঁয়ে তারা জিহাদের দীপ্ত শপথ নেয় এবং এক ছাত্রী রক্ত দিয়ে মসজিদের প্রাচীরে লিখে দেয় 'আযাদী'।

এরপর রাবেয়া বলখী স্কুলের ছাত্রীরা নাহিদের লাশ নিয়ে মিছিল করতে থাকলে তাদের উপর নির্বিচারে গোলাবর্ষন শুরু হয়। একে একে নিষ্ঠুর রুশীয়রা ২৩ জন ছাত্রীর জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেয়। আহত হয় আরো অনেকে।

এ ঘটনার পর আজ অনেক দিন পার হয়ে গেছে। হয়তো এসব মা-বোনদের কোরবানী আর ত্যাগের বিনিময়েই আফগানিস্তানের জমীনে উদিত হয়েছিল ইসলামের সোনালী সূর্য। পত্ পত্ করে উড্ডীন হয়েছিল ইসলামী পতাকা। কিন্তু ইসলামের দুশমনদের কুটিল ষড়যন্ত্র আর কিছু গাদ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই সূর্য আবারো অস্তমিত, সেই পতাকা আবারো অবনমিত।

মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্ব মুসলিমের অলস নিদ ভাঙ্গাবার জন্য এমন কিছু নাহিদ কি আবারও আত্মপ্রকাশ করবে না? হ্যাঁ, করবে। সেদিন হয়তো বেশী দুরে নয়। ❐

(সূত্র ঃ আফগানিস্তানে আমি আল্লাহকে দেখেছি।)

অবৈধ প্রেমের নিষ্ঠুর পরিণতি

প্রেম পবিত্র। আধুনিক যুবক যুবতীদের মুখে এ কথাটি প্রায়ই শুনা যায়। হ্যাঁ, প্রেম পবিত্র ঠিকই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন প্রেম পবিত্র? ঢালাওভাবে সকল প্রেমই কি পবিত্র? না, সব ধরণের প্রেম পবিত্র নয়, হতেও পারে না। স্বামী স্ত্রীতে যে প্রেম, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যে মুহাব্বত, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যে ভালবাসা, দেশের প্রতি দেশবাসীর যে টান, ছোটদের প্রতি বড়দের যে স্নেহের বন্ধন তার সবই হচ্ছে খাঁটি প্রেম। এ প্রেমই পবিত্র। ইসলামী শরীয়ত এ প্রেমকেই সমর্থন করে। শুধু সমর্থনই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে এ জাতীয় প্রেমকে ইসলাম অপরিহার্য করে দিয়েছে।

কিন্তু যুবক যুবতীদের বিবাহপূর্ব প্রেম-ভালবাসা, দেখা-সাক্ষাত, আলাপ-আলোচনা, মন দেয়া-নেয়া, চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান সবই হারাম এবং নাজায়েয। এ ধরণের প্রেমকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করেনি, করতেও পারে না। কারণ এ জাতীয় প্রেম-ভালবাসা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব জীবনকে ধ্বংস করে কিংবা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত করে। বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিন যতগুলো আত্মহত্যা ও এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে তার বেশীর ভাগই প্রেম ঘটিত কারণে ঘটে থাকে। সুতরাং যে প্রেম যুবক-যুবতীর পবিত্র চরিত্রকে কুলষিত করে, যে প্রেম মেয়েদের সতীত্ব হারানোর পথকে উন্মুক্ত করে, যে প্রেম মানব হৃদয়ে অস্থিরতার আগুন প্রজ্জ্বলিত করে, যে প্রেমের পরিণতিতে সুস্থ সবল ও স্বাস্থ্যবান মানুষও বিভিন্ন মারাত্মক ব্যধিতে আক্রান্ত হয়, যে প্রেম পিতা-মাতা ও বংশের মুখে চুনকালী পড়ার পথকে সুগম করে, সে প্রেম তথাকথিত প্রগতিবাদী আধুনিক যুবক-যুবতীদের ভাষায় যত পবিত্রই (?) হউক না কেন ইসলাম তাকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে পারে না। কেননা ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহা মানুষের কল্যাণ চায়, মঙ্গল চায়। অতএব, কোথাও মানুষের অমঙ্গল হওয়ার নুন্যতম সম্ভাবনা থাকলেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করে।

তথাকথিত প্রগতিবাদীদের পবিত্র (?) প্রেম যে মানব জীবনে কতটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য একটি বাস্তব মর্মান্তিক কাহিনী পাঠকবৃন্দের সামনে তুলে ধরছি-

১৯৮৯ সাল। ১৪০৮ হিজরী। অধুনা মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী কায়রোর এক ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রী। চার ভাই বোনের মধ্যে সেই সবার বড়। সে দেখতে যেমন সুন্দরী তেমনি জ্ঞান গরিমায় তুলনাহীন। সৎ গুণাবলী ও আখলাক চরিত্রে খুবই প্রসিদ্ধ। সকলের নিকটই ভীষণ প্রিয়। সহশিক্ষা, তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলা-মেশা, অশ্লীল বিনোদন ও অবৈধ প্রেম-ভালবাসা মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে ভয়ানক ধ্বংসলীলা বয়ে আনে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের এ মেধাবী ছাত্রীটির জীবনই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তার বিপর্যস্ত জীবন কাহিনীতে রয়েছে আধুনিক তরুণ-তরুণীদের জন্য বিরাট শিক্ষনীয় অধ্যায়। এই হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী কাহিনী পাঠ করে যৌবনের জোয়ারে দিশেহারা তরুণীরা যেন নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারে, সেজন্য নিজেই দরদী হয়ে তার নিজের কাহিনী সে এভাবে বর্ণনা করে-

প্রতিদিনের মত আজও ক্লাশ শেষ হলো। ক্যাম্পাস থেকে গেটের দিকে বেরিয়ে আসতেই এক যুবক সামনে এসে দাঁড়াল। চেহারায় দুষ্টামীর মুচকি হাসি। পোষাকে আভিজাত্যের কৃত্রিম রং। ভাবখানা এমন, যেন আমি তার পরিচিত কেউ। আমি তাকে গুরুত্ব না দিয়ে হাটতে শুরু করলে সেও আমার পিছু ধরল। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ আত্ম-সম্মান ও লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে প্রথম দেখাতেই সে বলতে লাগল, ওহে রূপসী! অনেকদিন ধরে আমি তোমাকে দেখে আসছি। জেনেছি তোমার অনেক কিছুই। হরিণীর মত কাজল কালো চোখ, চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখশ্রী এবং নির্মল-নিষ্কলুষ তোমার আখলাক চরিত্রে আমি মুগ্ধ। তাই আমি তোমাকে বিয়ে করে হৃদয়ের রানী বানাতে চাই।

জীবনে এই প্রথম আমি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। তার কথা শুনে আমার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। ঘৃণা ক্ষোভ আর লজ্জায় চেহারা লাল হয়ে গেল।

অবশেষে কোন কথা না বলেই বাসার দিকে দ্রুত পা বাড়ালাম। মনে হচ্ছিল, এখনই আমি মাটিতে পড়ে যাব। শেষ পর্যন্ত কোন রকম বাসায় গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

বাসায় যাওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন প্রকার দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরল। ভয়-ভীতির কালো মেঘ আমাকে অস্থির করে তুলল। ভবিষ্যতের এক অজানা আশংকায় বারবার আমার হৃদয়-মন কেঁপে উঠতে থাকল। শুরু হল দুশ্চিন্তার নিদ্রাহীন রজনী।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। অতঃপর আবার ভার্সিটিতে আসা যাওয়া শুরু করলাম। ভাবলাম, সে হয়তো আমাকে আর বিরক্ত করবে না। কিন্তু আমার এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হল। কারণ এরপর থেকে যখনই আমি ক্লাস শেষে বাসায় ফিরার জন্য গেটে আসি, তখনই তাকে সেখানে অপেক্ষমান দেখতে পাই। আমাকে দেখা মাত্রই একটি মিষ্টি হাসি ওষ্ঠ প্রান্তে বিলীন করে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসে। আমি কথা না বলে পাশ কেটে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সে আমার পিছে পিছে বাসা পর্যন্ত ছুটে আসে। এভাবে চলল, আরো কিছুদিন।

বেশ কয়েকদিন পর ঘটনা অন্য দিকে মোড় নেয়। একদিন সে বাসার গেটে এক টুকরো কাগজ ছুড়ে মারে। কাগজটি উঠাব কিনা এ চিন্তা করতে করতে একসময় তা কম্পিত হাতে উঠিয়ে পড়তে থাকি। দেখি, প্রেম-ভালবাসার রসালো কথায় ভরপুর সেটি। আমি যে তাকে এড়িয়ে চলি, উদাসীনতা দেখাই, এজন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করতেও সে ভুলে যায়নি।

চিঠি পাঠ করার পর আমার সমস্ত দেহে কম্পন শুরু হয়ে গেল। মনে হল, দেহের ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলেছি আমি। অবশেষে কাগজটি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করলাম। এ ঘটনার পর চিন্তার অথৈ সাগরে ডুবে গেলাম আমি। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই ফোনের আওয়াজে চিন্তায় ছেদ পড়ল। রিসিভার উঠাতেই দুষ্টের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এল। চিঠি পড়েছি কিনা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জানতে চাইল। জবাবে আমি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তাকে শাসিয়ে দিলাম। হুশিয়ার করে দিয়ে

বললাম, যদি তুমি জ্বালাতন বন্ধ না কর তাহলে এসব ঘটনা পরিবারের সবাইকে জানিয়ে দিতে বাধ্য হব। এ বলে রিসিভার রেখে দিলাম।

একটু পর আবার ফোন করল সে। এবার কান্না জড়িত কণ্ঠে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে লাগল, দেখ, আমি একজন ধনীর দুলাল। ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সার কমতি নেই আমার। অভাব কোন দিনই আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি। আমার কেবল একটি জিনিষেরই অভাব আছে। তাহল, একজন একান্ত আপন মানুষ, জীবন সঙ্গিনী। নশ্বর এ পৃথিবীতে আপনজন বলতে কেউ বেঁচে নেই আমার। তাই এত কিছু থাকার পরও আমি অশান্ত অস্থির। জীবনটি যেন হতাশা দুরাশার মরু-প্রান্তর। কি যেন না পাওয়ার বেদনায় বুকটা সব সময় হাহাকার করে। কোন কিছুতেই শান্তি পাই না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে বধূ বানিয়ে শান্তির নতুন নীড় রচনা করব। তোমার জন্য তৈরী করব অনাবিল শান্তির এক সুরম্য প্রাসাদ। তুমিই হবে আমার হৃদয় রাজ্যের একমাত্র রানী। তোমার কোন আশাই আমি অপূর্ণ রাখব না। যা চাইবে তাই পাবে তুমি। তোমার সামান্যতম কষ্টও আমি বরদাশ্‌ত করব না। আনন্দ উল্লাস আর চির প্রশান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবে আমাদের দাম্পত্য জীবন। ওহঃ, তখন কি মজাই না হবে!

কিছুক্ষণ পূর্বেও যে ছেলেটির প্রতি আমার ঘৃণা ও ক্ষোভের অন্ত ছিল না এখন তারই কিছু আকর্ষনীয় কোমল কথায় আমার হৃদয় মন সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লাম আমি। উপছে পড়া ভরা যৌবনে সামান্য পরিমাণ অগ্র পশ্চাত না ভেবে অভিভাবককে না জানিয়ে ইসলামের বিধান লংঘন করে তাকে নিয়েই আমি কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। হায়, তখন যদি আমি বুঝতাম!

যা হোক, এরপর থেকে শুরু হল মন দেয়া নেয়া। ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে লাগল প্রেম ভালবাসার রঙ্গিন মঞ্চ। ক'দিনেই রমরমা হয়ে উঠল প্রেমের গরম বাজার। ডুবে গেলাম ভালবাসার অথৈ সাগরে। হৃদয়ের গহীন কোনে কেবল তাকেই স্থান দিলাম। সে যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বের সাথে একাকার হয়ে গেছে।

তাকে ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। ক্লাস শেষে তাকেই খুঁজে বেড়াই। বাসায় এসে প্রতিটি মুহূর্ত কেবল তারই ফোনের অপেক্ষায় থাকি। পাঠকক্ষে বসে পড়া লেখা বাদ দিয়ে কেবল তার কথাই চিন্তা করি। ফলে সে-ই হল আমার জীবনের প্রধান পাঠ্যসূচী। এভাবে রঙ্গীন স্বপ্নে হাবুডুবু খেয়ে কেটে গেল আরও কিছু দিন।

আমি জানতাম, এ প্রেম অবৈধ, হারাম। এর পরিণতিও ভাল নয়। কিন্তু এটি একটি মেয়ের মূল্যবান জীবনকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে পারে, সমাজের উচ্চাসন থেকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে এত অপমানজনকভাবে নিক্ষেপ করতে পারে, তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। যৌবনের তাড়না আর ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন তা আমাকে ভাবারও অবকাশ দেয়নি।

এভাবে চলতে চলতে হঠাৎ আমার জীবনাকাশে নেমে এল আমাবস্যার আধাঁর। সে আধাঁর ধ্বংস করে দিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব ও চরিত্রকে। ধ্বসে পড়ল কল্পনার জগতে নির্মিত ভবিষ্যতের সুরম্য প্রাসাদ। গলায় জড়াতে হল কলংকের ঘৃণ্যমালা। হায় আফসোস, যদি আমি জানতাম!

প্রতিদিনের মত সে আজও আমাকে নিয়ে বেড়াতে বের হল। কিন্তু আজ বরাবরের মত হোটেল, পার্ক কিংবা মার্কেটে নয়। আজ নিয়ে গেল জনশূণ্য এক নির্জন বাসায়। ভিতরে ঢুকেই পাশাপাশি বসলাম। শুরু হল প্রেমালাপ। বাসায় লোকজন না থাকায় আমাকে নিয়ে একটু বেশীই মাতামাতি করছিল সে। আমিও তখন ভুলে গিয়েছিলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অমূল্যবাণী- 'কোন বেগানা নারী পুরুষ যখন নির্জনে একত্রিত হয় তখন শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়। (অর্থাৎ সে তখন উভয়কে প্ররোচিত করে অবৈধ কাজে লিপ্ত করে দেয়।)

আমাদের বেলায়ও তাই হলো। শত বাধা সত্ত্বেও সে জোরপূর্বক আমার মহামূল্যবান সতীত্ব কেড়ে নিল। ডুবিয়ে দিল জাহান্নামের প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে। হারিয়ে ফেললাম চরিত্র ও সতীত্বের মহাসম্পদ। আমি তাকে অভিশাপ দিতে দিতে বললাম,

হে নরপশু! কেন তুই আমাকে এই জঘন্য পাপে লিপ্ত করলে? কেন আমার সতীত্বকে জোরপূর্বক হরণ করলে? তোর কি মা বোন নেই? নিরুত্তাপ কণ্ঠে হেসে হেসে সে জবাব দিল, ভয় নেই সুন্দরী! তুমি তো আমারই স্ত্রী। আমি বললাম, কবে তোর স্ত্রী হলাম? সে আবারও একটি দুষ্টমির হাসি উপহার দিয়ে বলল, অতি শীঘ্রই তোমাকে বিয়ে করছি।

বিবেকের দংশনে উম্মাদিনী হয়ে বাসায় ফিরলাম। পদযুগল যেন আমার পাপী দেহটাকে বহনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। দেহের প্রতিটি রন্দ্রে রন্দ্রে অনুশোচনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কি থেকে কি হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে খোদার কাছে ক্ষমা চাইলাম। হাশরের ময়দানে খোদার দরবারে কি জবাব দিব এ ভয়ে দু'গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অন্ধকার যেন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও লেখাপড়া বন্ধ করে দিলাম। কারণ, লেখা পড়ার মূল লক্ষ্য চরিত্র গঠন। আমার তো আর চরিত্র বলতে কিছুই নেই।

আমার অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। খাওয়া-দাওয়া কমে গেল। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জীবনের প্রতি অনীহা ভাব সৃষ্টি হল। পরিবারের সবাই আমাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মূল রহস্য জানতে পারল না।

সে আমাকে বিয়ে করবে, স্ত্রীর মর্যাদা দিবে, হৃদয়ে এই একটি মাত্র আশা নিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু কই, আজ দীর্ঘ দিন যাবত তার কোন খুঁজ খবর নেই। একটি বার ফোনও করেনি। আমি আরও বেশী বিচলিত হয়ে পড়লাম। চিন্তা করার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেললাম। অবৈধ প্রেম আমার সাজানো গোছানো জীবনটিকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে দিবে, কোন দিন তা ভাবতেও পারিনি।

একদিন আবারও ফোন বেজে উঠল। রিসিভার উঠাতেই সে বলল, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে তোমার সাথে দেখা করতে চাই। ভাবলাম, বিয়ের ব্যাপারে হয়তো চূড়ান্ত কথা বলবে। তাই

আনন্দে আত্মহারা হয়ে এক বুক আশা নিয়ে দেখা করার জন্য তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। নির্দিষ্ট স্থানে তার সাথে দেখাও হল। কিন্তু তার চেহারা দেখে আমি আশ্চার্যান্বিত হলাম। কারণ যে ব্যক্তি এক সময় আমার প্রেম প্রাপ্তির আশায় মায়া কান্না জুড়ে দিয়েছিল, অনুনয়-বিননয় করেছিল, তারই চেহারায় আজ পাষন্ডতার কালো মেঘ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমি কিছু বলার পূর্বেই সে মুখ বিকৃত করে রুক্ষভাবে বলে উঠল, বিয়ের ব্যাপারে কখনই ভাববে না কিন্তু। আমি চাই, আমরা বিয়ের শৃংখলে না জড়িয়ে এরূপ আমোদ ফুর্তিতেই জীবনটা কাটিয়ে দেই। আমার বিশ্বাস, তুমিও আমার সাথে একমত হবে।

ধূর্ত পাষন্ডের কথা শুনে আমার ধৈর্যের সবক'টি বাঁধ একসাথে ভেঙ্গে গেল। মাথায় খুন চেপে বসল। মনের অজান্তেই ডান হাতের একটি প্রচন্ড চপেটাঘাত অত্যন্ত শক্তভাবে তার গালে আঘাত হানল। দেখা হওয়ার পর থেকে ভদ্রবেশী এ লম্পটের চোখে আমি কামনার যে আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম আঘাত খাওয়ার পর সে আগুন কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্তিমিত হল। আমি তাকে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললাম, হে ধূর্ত শয়তান! ভেবেছিলাম, আজ বুঝি তুই অতীত ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে এবং এর প্রতিকারের উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু তোর কথা শুনে আমার ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে যে, তুই মানুষ না পশু। আমার তো মনে হচ্ছে, তুই একটা মানবতা ও মনুষ্যত্বহীন দুশ্চরিত্র নরপিচাশ। তোর মত নারী লিপ্সুরা নারীকে কেবল ভোগ করতেই জানে. মর্যাদা দিতে জানে না। তোরা পশুর চেয়েও অধম, জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট।

হৃদয়ে পুঞ্জিভূত সমস্ত ঘৃণা আর ক্ষোভ মিশ্রিত আরও কিছু কথাবার্তা বলে যেই আমি বাসায় ফিরার জন্য রওয়ানা দিলাম তখনই সে একটি ভিডিও ক্যাসেট দেখিয়ে আমাকে বলল, এ ক্যাসেটই তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে। এ কথা শুনে অস্থির হয়ে গেলাম। বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, এর ভিতর কি আছে? সে বলল, সেদিনের সেই অপকর্মগুলো সম্পূর্ণ রেকর্ড করা

আছে এই ক্যাসেটে। এটিই হল তোমাকে কাবু রাখার একমাত্র উপায়। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আমার প্রতিটি হুকুম মেনে চল, আঙ্গুলের ইশারায় উঠাবসা কর, যখন যা চাই তাই নির্দ্বিধায় দিয়ে দাও তবেই কেবল এর ভয়ানক পরিণতি থেকে বাঁচতে পারবে।

তার কথাবার্তা শুনে কলজে ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল। অবশেষে দীর্ঘক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলামও। সে আবারও আমাকে অত্যন্ত কঠিন ভাষায় সতর্ক করল। শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচিয়ে কোন মতে সেখান থেকে চলে এলাম।

এবার অস্থিরতা আরও শতগুণে বৃদ্ধি পেল। জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। কদিন পর শুনলাম, ঐ নরাধম সত্যি সত্যিই ক্যাসেট দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। কিছুদিনের মধ্যে তা শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন ঘটনাক্রমে আমার আপন চাচাত ভাইয়ের হাতে ক্যাসেটটি পড়লে সব ঘটনা ফাঁস হয়ে গেল। আব্বা, আম্মা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জেনে গেল। পুরো এলাকায় বিদ্যুত গতিতে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জা অপমান ও লাঞ্ছনায় আমাদের বংশ গৌরব নিমেষেই মাটিতে মিশে গেল। সকলেই আমাকে নির্লজ্জ, বেহায়া, বংশের কলংক ইত্যাদি বলে ধিক্কার দিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে লোকালয় থেকে গা ঢাকা দিয়ে জীবন বাঁচালাম।

ক'দিন পর খবর পেলাম, আমার বৃদ্ধ পিতা অপমানের গ্লানি সইতে না পেরে ছোট বোনদের নিয়ে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাস, সেখানেও ক্যাসেটটি ছড়িয়ে পড়লে এলাকার লোকজন আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে শালিস বসাল। সেখানে আমার পিতা ও পরিবারের বিরুদ্ধে এমন অপমানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো যা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এভাবে আমরা দীর্ঘদিন যাবত পাপের নির্মম পরিণতি ভোগ করতে লাগলাম। ইজ্জত, সম্মান, সুনাম ও বংশ গৌরব হারিয়ে আজ আমাদের খুব ভাল করেই বুঝে আসল যে, খোদার অনুপম বিধান মানুষের জন্য কতই না সুন্দর! কতই না কল্যাণকর। আমি

যদি পর্দা রক্ষা করে চলতাম, আমার পিতা-মাতা ও পরিবারের লোকজন যদি আমাকে পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলাফেরা করতে বাধ্য করতেন তাহলে আমি এই সর্বনাশের শিকার হতাম না। গোটা পরিবারকেও এই কলংকের বোঝা বহন করতে হত না। আল্লাহ পাকের সুন্দর বিধান পর্দা অমান্য করার দরুণই আমাদের এই মর্মান্তিক পরিণতি।

কয়েকদিন পর সংবাদ পেলাম, এই দুশ্চরিত্র কুলাঙ্গার যুবকটি যাদুর ফাঁদে জড়িয়ে আমার মতো আরও অনেকগুলো কোমলমতি তরুণীর সোনালী ভবিষ্যত নষ্ট করেছে। তাদের সতীত্বও সে হরণ করেছে। অবৈধ প্রেমের করুণ পরিণতি তাদেরকেও ভোগ করতে হয়েছে। বংশের ঐতিহ্য-গৌরব সবই ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। এতে আমার হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সিদ্ধান্ত নিলাম, এই পাপিষ্ঠ নরাধমের নাপাক অস্তিত্ব যে কোন উপায়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিব। যেন সে আর কোন মেয়ের সর্বনাশ করতে না পারে।

আমি সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন দেখি, ঐ নিকৃষ্ট নরপশু মদমত্ত হয়ে ঢুলতে ঢুলতে আমার কাছে এল। ভাবলাম, এই তো সুবর্ণ সুযোগ। এ সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না। তাই দ্রুত পদে একটি ধারাল ছুরি সংগ্রহ করে তার বুক বরাবর বসিয়ে দিলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হল। আমি ছুরি হাতে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম, অল্পক্ষণের মধ্যে এই পাপিষ্ট দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিল। অবশেষে ঘরে ফিরে মনে হল, আজ আমি নারীর ইজ্জত হরণকারী মানবরূপী এক পশুকে হত্যা করে খোদার পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করলাম।

প্রিয় তরুণী বোনেরা আমার! আমি আজ আমার অতীত কুকর্ম ও ধ্বংস প্রাপ্ত জীবনের উপর ভীষণ লজ্জিত। যখনই আমার সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে তখনই আমার সমস্ত দেহ মন শিউরে উঠে। মনে চায় চিৎকার করে তোমাদেরকে বলি, কখনোই বিবাহপূর্ব অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ো না। যৌবনের উম্মাদনায় দিশেহারা হয়ে খোদায়ী বিধানকে লংঘন করো না।

যুবকদের মিষ্টি মধুর কথাবার্তা, রসালো আলাপ, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, টেলিফোন সংলাপ, প্রেম-নিবেদন ও অবাধ মেলামেশা থেকে বেঁচে থাক। এতেই তোমাদের সুখ, শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি রয়েছে। মনে রেখো, খোদা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সমানভাবে অবহিত। সুতরাং কিসে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে তা তিনিই ভাল করে জানেন। পর্দার অমোঘ বিধান পীর, দরবেশ কিংবা আলেমদের রচিত কোন বিধান নয় বরং এ বিধান মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালারই বিধান। আমি তোমাদের মূল্যবান জীবনের প্রতি দরদী হয়েই আমার কলংকময় জীবনের চিত্র তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। যেন আমার এ জীবন কাহিনী থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

বস্তুতঃ অবৈধ প্রেম কখনোই প্রকৃত শান্তি দিতে পারে না। প্রেমের নামে অবৈধ মেলা-মেশা এমনকি প্রচুর গল্প-স্বল্প করার পর যাদের বিয়েটা স্বাভাবিকভাবেও হয় তাদের দাম্পত্য জীবনেও সুখ থাকে না। যেহেতু উভয়ই প্রেমের দাবীতে সমান তাই দাম্পত্য জীবনের পারিবারিক ও সামাজিক সকল কাজেই তারা স্ব-স্ব প্রাধান্য বজায় রাখতে চায়। অপরের চেয়ে ছোট হওয়ার ভয়ে প্রকৃত সত্য ও ন্যায় কেউই গ্রহণ করতে পারে না। অন্যায়ের অসত্যের আগুন একবার কোন দম্পতির জীবন ও সংসারে প্রজ্জ্বলিত হলে তা পুড়িয়ে শেষ না করা পর্যন্ত নেভে না।

প্রেমের বিয়ে মূলতঃ মরণফাঁদ। এ ফাঁদ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য। অধুনা জগতের যুবক যুবতীদের প্রেম মানেই অবৈধ আচরণ। আর কোন অবৈধ জিনিষই কোন দিন কাউকে কল্যাণ দিতে পারে না। অবৈধ আচরণে অভ্যস্থ নর-নারীর জীবন বোধ, মানবতাবোধ, আত্মমর্যাদা বোধ, হায়া, ব্যক্তিত্ব, বিবেক সবকিছু হারিয়ে যায়। ফলে তারা পশু থেকে নিকৃষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং আজকে যারা অবৈধ প্রেমে লিপ্ত হয়ে ভবিষ্যত জীবনে সুখী হওয়ার রঙ্গিন স্বপ্ন দেখছেন, মনে রাখবেন, আপনাদের এই স্বপ্ন কখনোই বাস্তবায়িত হবে না। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তাওফীক দিন। আমীন। ❐

বর্বরতা ও পাশবিকতার একটি নির্মম চিত্র

ইউরোপের একটি ছোট্ট মুসলিম দেশ বসনিয়া। ১৯৯২ইং সালের ৬ই মার্চ একটি গণভোটের মাধ্যমে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণার পর শুধুমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে ইতিহাসের নির্মম অত্যাচার তাদের উপর চালানো হয়েছে। হাজারো নিরপরাধ মুসলমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। গণধর্ষণের শিকার হয়েছে হাজারো অবলা মুসলিম রমণী। লক্ষ লক্ষ শিশুকে করা হয়েছে এতীম অসহায়।

জাতিসংঘ ও পশ্চিমা বিশ্বের গোপন পরিকল্পনা ছিল ইউরোপে যেন কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্টের অভ্যুদয় না ঘটে। ফ্রান্স ও বৃটেন সহ ইউরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্র কড়া হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলল যে, ইউরোপের মাটিতে কোন স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র কোন ক্রমেই বরদাশত করা হবে না।

তাদের এই নাপাক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণার সাথে সাথেই অসভ্য সার্বীয় নরপশুরা নিরস্ত্র মুসলমানদের উপর অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। চলল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ বর্বরতা। যার সামনে চেঙ্গিস খান, হালাকু খান ও হিটলারের নাৎসী বাহিনীর বর্বরতাও ম্লান হয়ে পড়ল। মুসলমানদের উপর অভিনব পদ্ধতিতে চালানো হল পাশবিকতার নিষ্ঠুর ষ্টীম রোলার। খৃষ্টান নরপিচাশরা মা-বাবার সামনে তাদের সন্তানকে জবাই করে সেই গোশত দিয়ে কাবাব তৈরী করে তাদেরকে খেতে বাধ্য করেছিল। সন্তানের রক্ত গ্লাস ভরে মা বাবাকে পান করাচ্ছিল। গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে দেখছিল যে, পেটের সন্তানটি ছেলে না মেয়ে। বাপের সামনে তার মেয়ের সাথে, ছেলের সামনে তার মার সাথে, স্বামীর সামনে তার স্ত্রীর সাথে, ভাইয়ের সামনে তার বোনের সাথে সার্ব ও ক্রোট খৃষ্টানরা ইজ্জত লুণ্ঠন করছিল। অতঃপর অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে জবাই করে হত্যা করছিল। ছয় বছরের বালিকা থেকে নিয়ে সত্তর বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই তাদের পাশবিক নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। ছোট ছোট

শিশু বাচ্চারা তাদের মা বাবা আত্মীয় স্বজনের জবাইকৃত লাশের সামনে বসে চিৎকার করে কাঁদছিল এবং আম্মু আম্মু আব্বু আব্বু বলে ডাকছিল, কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার মত কেউ তখন দুনিয়াতে বেঁচে ছিল না।

কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শত চেষ্টা তদবীর সত্ত্বেও সার্বীয় নরাধমরা বসনিয়ার মুসলমান-দেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। মুসলমানরা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে গেল। এক সময় দেখা গেল, তাদের হাতেও হালকা, ভারী সব ধরণের অস্ত্র রয়েছে। তবে এই অস্ত্র তাদেরকে কেউ সাহায্য হিসেবে দেয়নি। এগুলো সবই সার্বদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া অস্ত্র। তবে এজন্য তাদেরকে অনেক কোরবানী দিতে হয়েছে। জান, মাল, ইজ্জত, আবরু সবই বিসর্জন দিতে হয়েছে। পারি দিতে হয়েছে রক্তের এক মহা সাগর।

প্রকৃত পক্ষে সার্ব-বসনিয়ার যুদ্ধটি ছিল ক্রুসেড ও আল হেলালের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ও আন্তর্জাতিক কুফরবাদের নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। বসনিয়ার মুসলমানরা এ যুদ্ধে এককভাবে যুদ্ধ করেছে। কোন মুসলমান রাষ্ট্রও তাদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। পক্ষান্তরে সার্বীয় নরপশুদের সাহায্যে ছিল সমস্ত খ্রীষ্টান ও কুফুরী শক্তি। এতদসত্বেও বসনিয়ার মুসলমানদের সামরিক ও নৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে একথা আবারও প্রমাণিত হল যে, মুসলমানগণ যদি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রেখে নিজের সামর্থ অনুপাতে কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন। পরাজয়ের গ্লানি খোদাদ্রোহীদের ভাগ্যেই জুটবে।

যুদ্ধ চলাকালে বসনিয়ার মুসলমানদের উপর যে হৃদয়বিদারক লোমহর্ষক ও অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল, তারই কয়েকটি খন্ড চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

বসনিয়ার এক মুসলিম সাংবাদিক আবদুর রাজ্জাক হেকনোভিক। জিমু নামেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। ৩০ মে ১৯৯২ ইং স্বাধীন মুসলিম বসনিয়ার সমর্থন করার অপরাধে

আরও অন্যান্য মুসলমানদের সাথে তিনিও সার্বীয় হায়েনাদের হাতে বন্দী হন। সার্বদের বন্দী শালায় অবস্থান কালে তিনি স্বচক্ষে এমনসব বিভীষিকাময় বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছেন যা শুনলে যে কোন মানুষের শিরায় শিরায় চেতনার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে। তিনি বলেন-

একদিন কয়েকজন কয়েদীকে কামরা থেকে আনুমানিক ৪০ গজ দূরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেন দেহের সকল কাপড় চোপড় খুলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যায়। অসহায় বন্দীরা নির্দেশ পালন করে লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলো। অপর দিকে নরাধম কারারক্ষীরা এ করুণ অবস্থাকে পরম তৃপ্তির সাথে উপভোগ করল। কিন্তু একজন হৃষ্টপুষ্ঠ কয়েদী কাপড় খুলতে অস্বীকৃতি জানাল। সে মাথা নিচু করে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। মনে হল, সে যেন তাদের হুকুম শুনতেই পায়নি। একজন সৈনিক বন্দুকের নল তার গর্দানের উপর রেখে তাকে কিছু বলল। কিন্তু এতেও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এলো না। সে তার ইচ্ছায় অনড় ও অবিচল রইল।

বর্বর কারারক্ষীটি যখন দেখল, লোকটি তার নির্দেশ পালনে বিলম্ব করছে তখন সে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি ফাঁকাগুলি ছুড়ল। কিন্তু এতে শুধু এতটুকু ফায়েদা হল যে, পাশের বৃক্ষে বসা কয়েকটি পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। কিন্তু সেই কয়েদীর দৃঢ়তার মধ্যে কোন ফাটল ধরল না। সে আগের মতই ভাবলেশহীন ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। এবার ক্রুদ্ধ সৈনিকটি অত্যন্ত নির্মমভাবে সেই কয়েদীর মাথায় একের পর এক প্রচন্ড আঘাত হানতে লাগলো। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে শেষ পর্যন্ত সে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল। মাথা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তে তার সমস্ত চেহারা রঞ্জিত হয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় বারবার সে কঁকিয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু নিষ্ঠুর কারারক্ষীর এতে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হল না।

এর পরের ঘটনা আরও বেশী হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। সার্ব হায়েনাটি এবার তার বন্দুকটা অন্য একজন সাথীর হাতে দিয়ে স্বীয় প্যান্টের বেল্টে লাগানো হোলিস্টার থেকে একটি

চকচকে লম্বা ধারাল চাকু বের করল। অতঃপর লুটিয়ে পড়া কয়েদীটিকে চুল ধরে টেনে উঠিয়ে তার সাথে শুরু করল নিষ্ঠুর পৈশাচিক খেলা। সাথে আরেক পাষন্ডও তার সাথে তীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে যোগ দিল। প্রথমেই তারা কয়েদীর কাপড়গুলো দেহের চামড়াসহ কাটতে লাগলো। কেটে যাওয়া স্থানগুলো থেকে বয়ে চললো রক্তের স্রোত ধারা। তার হৃদয়বিদারক চিৎকারে সমস্ত ক্যাম্পের পরিবেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সকল কয়েদী তার আর্তনাদ ও আহাজারিতে আতংকিত হয়ে পড়ল। সাংবাদিক জিমু বলেন, আমি জীবনে এমন বিভীষিকাময় দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। একজন জীবিত মানুষের সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর আচরণ কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি।

এদিকে হতভাগা কয়েদীটি ভূমি থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তার পুরা অস্তিত্বটা রক্তে রক্তাক্ত হয়ে গেছে। লোকটি নিজের চিৎকার থামানোর ব্যর্থ চিৎকার করছে। মনে হচ্ছে, যেন একটি গরুকে জবাই না করেই চামড়া ছিলা হচ্ছে। একজন কারারক্ষী কাছেই রাখা একটি পানির পাইপ উঠিয়ে কায়েদীটিকে লক্ষ্য করে প্রচন্ড বেগে পানি ছেড়ে দিল। এতে যখমের সাথে পানি মিশ্রিত হয়ে যন্ত্রণার মাত্রা আরোও তীব্র হলো। সে পানির স্রোত থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। তার ভারী দেহটি একবার উঠছে, আবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোনভাবে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারছে না। এরপর উপস্থিত লোকেরা যা দেখল, তারা হয়তো জীবনেও তা ভুলতে পারবে না। তারা দেখল, নিষ্ঠুর কারারক্ষীরা অত্যন্ত পৈশাচিক কায়দায় লোকটির পুরুষাঙ্গ গোড়া থেকে কেটে ফেলল। সেখান থেকে রক্তের একটা তীব্র স্রোত বয়ে চলল। অতঃপর নির্দয় পাষন্ডরা তার শরীরের বড় একটা অংশও কেটে ফেললো। এ করুণ দৃশ্য অবলোকন করে আমি জ্ঞান হারালাম। ফলে এরপর কি ঘটল তার কিছুই আমি বুঝতে পারিনি। হুঁশ ফিরার পর লোকজন আমাকে বলল, লোকটিকে সার্বীয় পশুরা অত্যন্ত নির্মমভাবে জবাই করার পর তার লাশকে টেনে হেঁচড়ে একটি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়। অতঃপর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ❐

মুসলমানদের ইজ্জত নিয়ে হোলিখেলা

চরম মুসলিম বিদ্বেষী সার্বীয় খৃষ্টানরা বসনিয়ার নিরীহ মুসলমানদের উপর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার যে নির্মম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল, তারই আরেকটি ছোট্ট উদাহরণ সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

মুহাম্মদ আলীজাহ। ৬০ বছরের বৃদ্ধ। বন্দী শিবিরে অবস্থানকালে ভয়, আতংক এবং সার্বীয় নরপশুদের প্রতিদিনকার শারীরিক ও মানসিক নিষ্ঠুর নির্যাতনে মাথার চুলগুলো বোধ হয় সময়ের পূর্বেই পেকে সাদা হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন এলাকার পরম শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত ব্যক্তি। সকলেই তাকে প্রাণভরে ভালবাসতো।

একদিনের ঘটনা। ৬০ বছরের এ সম্মানিত বৃদ্ধকে এক অসভ্য সার্ব সেনা নির্দেশ দিয়ে বলল, এক্ষুণি বাইরে এসে কাপড় চোপড় খুলে উলঙ্গ হয়ে যাও। তিনি বাইরে আসলে জোরপূর্বক তাকে উলঙ্গ হতে বাধ্য করা হলো। একজন গার্ড হায়েনার হাসি হেসে বলল, বুড়ো! ভয় পেয়ো না। তোমার জন্য আজ আনন্দ উল্লাসের এক উত্তম ব্যবস্থা করা হয়েছে। একথা বলে বৃদ্ধকে হাজেরা নামক এক মুসলিম যুবতীর কামরায় নিয়ে গেল।

হাজেরার বয়স সর্বোচ্চ ১৮ বছর হবে। তাকেও অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে সকলের সামনে বিবস্ত্র করা হলো। মেয়েটি লজ্জায় চোখ বন্ধ করে দু'হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করল এবং অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে কেঁদে কেঁদে কাপড় পরার অনুমতি চাইল। কিন্তু বর্বর অসভ্য সার্ব সেনারা তাকে কাপড় পরতে দিল না।

অতঃপর তাদের উভয়কে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে নির্দেশ দেয়া হল তারা যেন সমস্ত কয়েদীদের সামনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বৃদ্ধ লোকটি সার্ব সেনাদের কাছে দু'হাত জোড় করে অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে বলল, দেখুন, হাজেরা আমার নাতনীর সমান। ওর সাথে এমন জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়ার কথা বলবেন না। এতে আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হবেন।

বৃদ্ধের একথা শুনে পাষন্ডরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একজন বলে উঠল, দেখ না, এ বুড়ো আবার কত অভিমান করছে। আমাদের কাছে এ মুহূর্তে এর চেয়ে কচি কোন মেয়ে নেই। আমরা যদি এর সাথে যৌন লালসা পূর্ণ করতে পারি তাহলে তোমার জন্যও ঠিক হবে। দেরী করো না। কাজে লেগে যাও।

কিন্তু বৃদ্ধ মুসলমানটি আবারও অস্বীকৃতি জানালে একজন সেনা অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল, বুড়ো! এ মজার কাজটিতে লিপ্ত হতে রাজী হচ্ছ না? তোমাকে রাজী হতেই হবে। স্বেচ্ছায় রাজী না হলে কিভাবে রাজী করাতে হয় তাও আমার ভাল করেই জানা আছে।

সে অন্যান্য গার্ডদের নির্দেশ দিয়ে বলল, এ বুড়োটাকে বাইরে বৃষ্টির মধ্যে নিয়ে যাও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ কাজে লিপ্ত হতে রাজী না হবে ততক্ষণ তাকে বাইরে রেখে দাও।

বাইরে কনকনে শীত। প্রচন্ড ঝড় বইছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বর্বর পাষন্ডরা সম্মানিত বৃদ্ধকে সম্পূর্ণ খালি গায়ে এই ঝড় বৃষ্টি ও হাড় কাঁপানো শীতের মাঝে পূর্ণ দুই ঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখল। অতঃপর মুমূর্ষ অবস্থায় ভিতরে এনে পুনরায় যৌনকর্ম সম্পাদন করার নির্দেশ দিল। কিন্ত এবারও তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ অন্যায় নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে সার্ব হায়েনারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাইফেলের বাট ও আর্মি বুট দিয়ে প্রচন্ড বেগে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলো। এ নরপশুদের হিংস্র আক্রমনে টিকতে না পেরে অবশেষে জ্ঞান হারিয়ে তিনি ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এবার আরেকটি হিংস্র দানব হুংকার ছেড়ে বলল, এই অপবিত্র পুটলীটাকে বাইরে ফেলে দাও।

মুহাম্মদ আলী জাহকে দরজার বাইরে ডান দিকে খোলা জায়গায় ফেলে দেয়া হল। সারাটি রাত এভাবেই চলে গেল। সকালে দেখা গেল, ষাট বছরের এ সম্মানিত বৃদ্ধ ইহধাম ত্যাগ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া..... । ❐

আরেকটি মর্মান্তিক ঘটনা

রেজু নামের একজন শান্তিপ্রিয় মানুষ। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী তিনি। স্নেহ-মায়া-মমতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একদিন তিনি গার্ডদের তাড়াহুড়ার কারণে কেন্টিনে দেয়া রুটিখানা খেয়ে শেষ করতে না পেরে কামরায় এসে খাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন গার্ড তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা পাশবিক হাসি হেসে 'হ্যালো' বলল। এতে মুহূর্তের জন্য রেজুর কাছে সেই গার্ডটিকে সহানুভূশীল ও ভদ্র মনে হল। তাই সে আবেগের বশবর্তী হয়ে বসনিয়ান ভাষায় বলল 'বজরুম' অর্থাৎ আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু এই ধন্যবাদই তার জন্য কাল্ হয়ে দাঁড়াল। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, বর্বর হায়েনাদের বিবেচনায় ধন্যবাদ দেওয়াও মারাত্মক অপরাধ। যার একমাত্র শাস্তি, নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর নৃশংস হত্যা।

যাহোক, রেজুর মুখ থেকে ধন্যবাদ শব্দটি শুনার সাথে সাথে গার্ডটির সমস্ত অস্তিত্বে যেন আগুন ধরে গেল। সে রাগে বিষধর সাপের ন্যায় ফুঁসে উঠলো। চেহারা বিকৃত করে বলল, তোর এত বড় স্পর্ধা! তুই আমাকে তোর সমকক্ষ মনে করে ধন্যবাদ বলার সাহস পেলে কোত্থেকে? দাড়া, এখনই তোকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একথা বলে হিংস্র দানবের ন্যায় পাষন্ড নরপশুটি রেজুর চুল শক্ত করে ধরে লোহার রড দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করতে করতে তাকে উপরে নিয়ে গেল। সে প্রথমে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তার কান দুটো ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে ফেললো। তারপর আরো কয়েকজন পাষন্ডের সহযোগিতায় রেজুর জিহ্বাটা একটানে বের করে কেটে ফেলার সময় বললো, যে জিহ্বা দিয়ে তুই ধন্যবাদ বলেছিস, তা তো আর রাখা যায় না।

এবার শুরু হল বর্বরতার অন্য পর্যায়। তারা রেজুর চোখে রড ঢুকিয়ে তা উপড়ে ফেললো। অতঃপর ধারাল ছুরি দিয়ে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ একের পর এক কাটতে লাগলো।

রেজুর করুণ আর্তনাদ আর বিকট চিৎকার ধ্বনিতে পুরো কামরাটি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। খোলা ময়দানে বসা কয়েদীরাও তার হৃদয়বিদারক আহাজারি শুনে নীরবে অশ্রু ঝরাচ্ছিল। কিন্তু কেউ উপরে গিয়ে তাকে সাহায্য করাতো দূরের কথা, বরং নিজ স্থান থেকে নড়তেও সাহস পেলো না। কিছুক্ষণ পর রেজুর গোঙ্গানী ও চিৎকার ধ্বনি আর শোনা গেল না। চিরদিনের জন্য তিনি এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিলেন। পনের বিশ মিনিট পর সেই পাষন্ড, দু'জন কয়েদীকে কামরায় তলব করে নির্দেশ দিল, এ নর্দমার কীটটিকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল। তারা রেজুর রক্তাক্ত কর্তিত লাশ বহন করে নীচে নিয়ে গেল।

এদিকে রেজুর স্ত্রী রেজুর ব্যবহার করা বিশেষ চেয়ারে বসে হাতের তালুর উপর চিবুক রেখে রেজুর আগমনের অপেক্ষায় রাস্তার পানে তাকিয়ে থাকতো। তার সন্তানরাও পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে তাকে এক নযর দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে সময় কাটাত। কিন্তু হায়! তারা কেউই জানত না যে, তিনি আর কোনদিন তাদের নিকট ফিরে আসবেন না।

বসনিয়ার মুসলমানদের উপর এ জাতীয় হাজারো নির্যাতন নিপীড়ন চলেছে। কাশ্মীর, চেচনিয়া, আরাকান, ফিলিস্তিন, গুজরাট, নাইজেরিয়া, স্পেন, আফগানিস্তান ও ইরাকসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদের উপর নেমে এসেছে এমন কিয়ামতসম নিষ্ঠুর বর্বরতা যা অন্ধকার যুগের বর্বরতাকেও হার মানায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও প্রতিদিন মুসলমানদের উপর হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক অত্যাচার চলছে। জানি না, এর ধারাবাহিকতা আরও কতদিন চলবে।

প্রিয় পাঠক! আমরা তো সেই উমর ইবনুল খাত্তাব, খালিদ বিন ওয়ালিদ, গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ূবী, মুহাম্মদ বিন কাসিম ও তারেক বিন যিয়াদ (রা.) এর উত্তরসূরী যাদের নাম শুনলে বাদশাহী তখত পর্যন্ত কাঁপতে শুরু করতো। কিন্তু আজ আমরা দুনিয়ার প্রতি মোহগ্রস্থ হয়ে যতই ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে চলে

যাচ্ছি এবং জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হওয়ার তামান্না যতই কমে যাচ্ছে কুফুরী শক্তির পক্ষ থেকে নির্যাতন নিপীড়নের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে মুসলমানদের দেখলে কাফের মুশরিকরা চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পেতো না, তারাই আজ আমাদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা খেলছে।

নিষ্পাপ শিশুদের কান্না, অবলা নারীদের আর্তনাদ, নিপীড়িত ঈমানদারদের হাহাকারে আজ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজা বাদশাহদের যেন তাতে কিছুই আসে যায় না। একটু নিন্দা জ্ঞাপন ও দু'একটি বিবৃতি দিয়েই তারা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে মনে করেন। অথচ সময়ের দাবী হল, পরস্পরের যাবতীয় মত পার্থক্য ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জিহাদী চেতনাকে শাণিত করা এবং পৃথিবীর যে কোন দেশের মুসলমানগণ কুফুরী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের বিরুদ্ধে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়া।

তাই আসুন, আমরা সকলে নিজেদের শোধরে নেই এবং ইসলাম ও মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। ফেরাউনদের দৌরাত্ম সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সুতরাং পতন তাদের নিশ্চিত। ঈমানদারদের বিজয় অত্যাসন্ন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হইও না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে প্রকৃত মুমিনের গুণাবলী অর্জনে সচেষ্ট এবং জেহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার তৌফিক নসীব করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন। ❐

বিশেষ আহ্বান

আমি ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বর্জন করেছি। আপনিও করুন। এ ব্যাপারে অপরকেও উৎসাহিত করুন। এটা আমার, আপনার, সকলের ঈমানী দায়িত্ব -লেখক

মেয়েদের তো এমনই হওয়া চাই

একজন পুরুষ যেমন জীবন সঙ্গীনী হিসেবে এমন একজন মেয়েকে চায় যার মধ্যে সকল প্রকার মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে, ঠিক তেমনি একটি মেয়েও তার হৃদয় রাজ্যের রাজা হিসেবে এমন একজন পুরুষকে কল্পনা করে যার চরিত্র হবে ফুলের মত সুন্দর। যিনি নম্র ও ভদ্রতায় হবেন অতুলনীয়। যার আচার ব্যবহার হবে ঈর্ষনীয়। শিক্ষা-দীক্ষায় আদবে আখলাকে যিনি হবেন সকলের অনুকরণীয়। যার ব্যবহার মাধুর্য সকলকে করবে মুগ্ধ। দেখায় শুনায় যিনি হবেন অন্য দশজনের চেয়ে বেশী আকর্ষনীয়। কিন্তু সবার কি এ আশা পুরণ হয়?

না, সবার এ আশা সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয় না। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে যেমন ভাল মেয়ের অভাব রয়েছে, তেমনিভাবে দিন দিন ভাল ছেলের অভাবও প্রকট আকার ধারণ করছে। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা থেকে আমরা যতই দূরে যাচ্ছি, ভাল পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ ততই কমে যাচ্ছে। ফলে ছেলেদের পাশাপাশি অনেক মেয়েদের ভাগ্যেও এমন অভদ্র, অসভ্য ও চরিত্রহীন স্বামী জুটছে যাদের উচ্ছৃংখল চলাফেরা, লাগামহীন জীবন যাত্রা কখনোই দাম্পত্য জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে না।

খোদা না করুন, যদি কোন মেয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ এ জাতীয় কোন চরিত্রহীন ছেলেকে আপন জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়ে বসেন তাহলে তার করণীয় কি? কি উপায় অবলম্বন করলে সে তার দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে পারবে; কিভাবে সে তার স্বামীর আখলাক চরিত্র সুন্দর করতে সক্ষম হবে; আমার বিশ্বাস, নিম্নোক্ত বাস্তব ঘটনা থেকে সে এই দিক নির্দেশনাই পাবে। চলুন এবার মনোযোগ সহকারে ঘটনাটি শুনি।

এক অভিজাত পরিবারের মেয়ে আজীজা। সে ছিল যেমন সুন্দরী, তেমনি নম্র, ভদ্র ও লাজুক স্বভাবের মেয়ে। মহান কারিগর আল্লাহ তায়ালা যেন স্বীয় হস্তে আপন নৈপুণ্য ও শৈলীতে সৃষ্টি করেছেন এ মেয়েটিকে। এ যেন বেহেশতের হুর!

তার লম্বা কেশগুচ্ছ, কাজল কালো বড় বড় চোখ, মানানসই দেহয়াবব তার সৌন্দর্যকে আরো শতগুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে কেবল রূপই দেননি গুণও দিয়েছিলেন। একটি মেয়ের মধ্যে যতগুলো প্রশংসনীয় গুণ থাকা দরকার তার সবই আজীজার ছিল। তার রূপ আর গুণের প্রশংসায় সকলেই ছিল পঞ্চমুখ। সুতরাং এমন একটি অনিন্দ সুন্দরী ও গুণবতী মেয়েকে কে না চায়?

বাস্তবেও তাই হল। সকলেই তার জন্য পাগলপারা। এলাকার ছেলেরা তো আছেই। বহু দূর-দুরান্ত থেকেও আজীজার বিবাহের প্রস্তাব আসতে থাকে। এমন একটি মেয়েকে জীবন সঙ্গীনী হিসেবে পেয়ে সকলেই দাম্পত্য জীবনে সুখী হতে চায়।

আজীজা এখন ষোড়শী। তার যৌবনের ষোলকলা এখন পরিপূর্ণ। তার পিতাও একজন সৎ ও চরিত্রবান ব্যক্তি। সুতরাং তিনি বিভিন্ন দিক চিন্তা ভাবনা করে এক শিক্ষিত যুবকের সাথে আজীজার বিবাহ পরিয়ে দেন।

আজীজা ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমতি। শ্বশুর বাড়ীতে আসার পর নববধূ আজীজার চোখ সর্বদা অবনমিত থাকলেও কান দুটো ছিল সদা সচেতন। সে ধীরে ধীরে শ্বশুরালয়ের পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝার চেষ্টা করে।

আজীজার শ্বাশুরীর নাম নাঈমা। তার মেজাজ ছিল অত্যন্ত কর্কশ। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ঝগড়া-ঝাটি করা তার নিত্যদিনের অভ্যাস। গর্ব, অহংকার আর আত্ম-অভিমান ছিল তার চরিত্রের অনন্য বৈশিষ্ট্য। পুত্রবধূর প্রতি তিনি এমন বাঁকা চোখে তাকাতেন, যেন এখনই তাকে গ্রাস করে ফেলবে।

আজীজার ছিল তিন ননদ। বড় ননদ সুলতানা বিবাহিতা হলেও বদ মেজাজীর কারণে তালাক প্রাপ্ত হয়ে পিত্রালয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ভাবীর সাথে খোশগল্প করার সময় কোথায়? শ্বশুর শ্বাশুরী আর ভাবীর নিন্দা করতেই তার সারাদিন চলে যায়। ভাবীর সাথে হাসি মুখে একটু কথা বলা তো দূরের কথা, সোজা মুখে কথা বলাও ছিল তার জন্য এক অকল্পনীয় ব্যাপার। পাড়ার অন্যান্য মেয়েদের নিকট ভাবীর নামে বানিয়ে

বানিয়ে দূর্ণাম রটনা করা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস। পরে শুনতে পেয়ে বিনয়ের সাথে আজীজা এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এক শ্বাসে শুনিয়ে দিত হাজারো কথা। যেমন, সে মুখ বিকৃত করে রাগত স্বরে বলতো, আমার বুঝি খেয়ে-দেয়ে আর কাজ নেই। চোরের মন সর্বদা পুলিশ পুলিশই করে। তোমার জন্য আমাকে মুখ সেলাই করে নিতে হবে নাকি? তুমি কোন জায়গার মেম যে, তোমার সামনে কেউ কথা বলতে পারবে না? মনে রেখ, এ ঘর তোমার নয়, বরং এটি আমার মা-বাবার ঘর ইত্যাদি।

আজীজা ননদের এসব কথা নীরবে সহ্য করতো। এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিত। সে জানতো, খারাপের সাথে খারাপ ব্যবহার করে কোন লাভ নেই। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "তোমার সাথে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর। তাহলে তোমাদের শত্রুতা অকৃত্রিম বন্ধুত্বে পরিণত হবে।" (সূরা হা-মীম সেজদাহ ঃ ৩৪)

হাদীস শরীফে আছে, "কোন ব্যক্তি যখন অন্যের মন্দ কথা শুনে ধৈর্যধারণ করে এবং তার পাল্টা উত্তর না দেয় তখন ফেরেশতারা তার পক্ষ হয়ে জবাব দেয়। আর আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যশীলকে ভালবাসেন এবং তার মর্যাদাও বাড়িয়ে দেন।"

সেঝো ননদের নাম তাহেরা। সেও ছিল মারাত্মক হিংসুটে, ঝগড়াটে ও বাচাল স্বভাবের মেয়ে। কথায় কথায় অভিশাপ দিত। তার স্বভাব বুঝতে পেরে আজীজা এমনভাবে চলতো যে, ঝগড়া হওয়ার কোন সুযোগই দিত না। উপরন্তু সে উত্তম চরিত্র ও সীমাহীন উদারতার পরিচয় দিয়ে সবই সহ্য করে নিত এবং নিজেকে এ বলে সান্ত্বনা দিত যে, বোকার সাথে বোকামী করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। নাপাক পানি দ্বারা নাপাক দূর হয় না বরং পাক পানি দ্বারা নাপাকী দূর হয়।

ছোট ননদ রাজিয়া ছিল সাত/আট বছরের কচি মেয়ে। তাকে আজীজা শুরু থেকেই বাগিয়ে নিয়েছিল। তাই সে সর্বদা ভাবীর পক্ষে সমর্থন দিয়ে যেত।

আজীজার স্বামী ছিল ইংরেজী শিক্ষিত এক আলট্রামর্ডান যুবক। তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত প্যান্ট-কোর্ট, টাই-জুতো ইত্যাদির ঠাট বাট ঠিক রাখতে। ঘরোয়া কাজের সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। প্রথম প্রথম আজীজার প্রতি তার মায়া মমতা ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে তা লোপ পেতে থাকে। এর মূল কারণ ছিল শ্বাশুড়ীর হিংসাত্মক মনোভাব। তিনি ভিতরে ভিতরে ছেলেকে স্ত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতেন এবং সর্বদা উভয়ের মাঝে বিভেদ ও ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টায় লেগে থাকতেন। অবশেষে স্বামীর অবস্থা এই দাঁড়াল যে, অফিসের বাইরের সময়টুক বন্ধু-বান্ধবের সাথে আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিত। এমনকি খানাও বাইরে খেত। প্রায়ই রাত ১টা/২টায় বাসায় ফিরত। মনে চাইলে তড়িঘড়ি করে কিছু খেয়ে সটান হয়ে শুয়ে পড়তো। কখনো মন না চাইলে বাসায়ও ফিরত না। বন্ধুদের সাথেই রাত কাটাত।

মোট কথা, স্বামী শাশুড়ী আর ননদের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও চলাফেরার কারণে তাদের গোটা পরিবারেই নেমে এসেছিল অশান্তির কালো অমানিশা। শান্তি শৃংখলা ও দায়িত্ব বোধ বলতে সেখানে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আজীজার স্বামী ও শ্বশুরের আয় দিয়ে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার স্বচ্ছলভাবে চলতে পারে। কিন্তু তাদের উশৃংখল জীবন ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক মিল মহব্বত না থাকার কারণে সর্বদা অভাব অনটন লেগেই থাকত। ঘরের সর্বত্রই দেখা যেত বিশৃংখল ও অগোছালো অবস্থা। আজীজার শ্বশুর ছিলেন খুবই সরল মানুষ। তার এই সরলতাকে দূর্বলতা মনে করে শাশুড়ী যা ইচ্ছে তাই করত। সব বিষয়ে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে দূরের কথা ,স্বামীকে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন না। ফলে এ পরিবারটি মহিলা শাসিত পরিবারে পরিণত হয়েছিল। আর মহিলা শাসিত পরিবারে শান্তির সম্ভাবনা শতকরা কত ভাগ তা বোধ হয় সম্মানিত পাঠকদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার দরকার হবে না।

যা হোক, সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে সর্ব প্রথম আজীজা তার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে সঠিক পথে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য

সকল প্রকার নেতিবাচক দিক পরিহার করে ইতিবাচক দিক গুলোকেই গ্রহণ করে সে। কারণ বুদ্ধিমতি আজীজা খুব ভাল করেই জানতো যে, স্বামীকে কখনোই শাসন করে, চোখ রাঙ্গিয়ে, কড়া কড়া কথা বলে, মেজাজ দেখিয়ে সঠিক পথে আনা যায় না। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে বেশী। স্বামীকে পথে আনার জন্য প্রয়োজন অগাধ প্রেম, সীমাহীন আন্তরিকতা ও মধুময় আচার আচরণ। অর্থাৎ নম্রতা-ভদ্রতা, সেবা-শশ্রুষা আর আন্তরিক ভালবাসার মাধ্যমে স্বামীর হৃদয় মন জয় করে নিতে পারলেই তাকে ধীরে ধীরে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা একশ ভাগ সম্ভব হবে। তাই সে প্রতিজ্ঞা করল, যে ভাবেই হোক স্বামীর মন জয় করতেই হবে।

যেই কথা সেই কাজ। শুরু হল মন জয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টা। আগের চেয়ে আরও বহু গুণ বেশী পরিমাণে। এটিই যেন তার একমাত্র কাজ। এজন্য যত পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন তার সবই সে পালন করে ধীরে ধীরে স্বামীর মন জয় করে যাচ্ছিল।

আজীজার স্বামী সারাদিন ঘরে কদম রাখতো না। মাঝরাত পর্যন্ত খেলাধুলা ও আড্ডায় মাতামাতি করতো। এদিকে সে নীরব ঘরে একাকী ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে থাকত। কখনও ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়তো। আবার কখনও কিছু সেলাই করতে বসতো। অনেক সময় ঘুমের তাড়নায় পড়ে যেত, তথাপি বিছানায় পিঠ লাগাত না। সে মনে করতো, তিনি যত খারাপই হউন না কেন, আমার তো স্বামী। আর স্বামী ভাল হলে তার খেদমত করবো, শ্রদ্ধা করবো, তার কথা মত চলবো, তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসবো, আর খারাপ হলে কিংবা আমার মনপুত না হলে তাকে মানবো না, খেদমত করবো না, তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবো-এ অধিকার তো ইসলাম আমাকে দেয়নি। বরং ইসলাম তো সর্বাবস্থায় স্বামীর খেদমত করার এবং তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসার কথা বলেছে। বলেছে তাকে খুশি রাখার কথা। যেমন এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

হে রমনীরা! স্বামীই তোমাদের বেহেশত অথবা দোযখ। অর্থাৎ তোমরা যদি তার কথামত চলে তার খেদমত করে, প্রেম ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে তাকে খুশি রাখতে পার তাহলে তোমাদের জন্য জান্নাত অবধারিত। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের আচার আচরণে তারা নারাজ হন, অসন্তুষ্ট হন তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে সীমাহীন কষ্টের স্থান জাহান্নাম।

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, মহিলাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্বামীকে খুশি রাখে। কোন কিছুর হুকুম করলে তৎক্ষনাৎ তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর অপছন্দনীয় কোন আচরণ করে না। অর্থাৎ নিজের জান ও মাল দিয়ে সে এমন কোন কাজ করে না যা তার স্বামী অপছন্দ করে।

এ সকল হাদীস জানা থাকার কারণে আজীজা স্বামীর মনকে খুশি করার জন্য অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খানা পাকিয়ে স্বামীর অপেক্ষায় দরজার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বসে থাকতো। স্বামী আসার সাথে সাথে ঝট করে দরজা খুলে দিত এবং 'আসসালামু আলাইকুম' বলে একটি মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে তাকে বুকে টেনে নিত। তারপর ২/৪ মিনিট স্বামী স্ত্রী সুলভ কিছু আচরণ সেরে বিনীত স্বরে জিজ্ঞাসা করতো, প্রিয়তম! বাইরে কোন কষ্ট হয়নি তো? আমি আপনার জন্য পানি গরম করে রেখেছি। আসুন, হাত মুখ ধুইয়ে দেই। একথা বলে সে নিজের হাতে স্বামীর হাত মুখ ধুয়ে দিত এবং আপন উড়নার আঁচল দিয়ে পানি মুছে দিত। খানা আগেই প্রস্তুত। তরকারী পূর্বেই গরম করে রাখা হয়েছে। যেন সব অটোমেটিক ব্যাপার।

খানার সামনে স্বামীকে বসিয়ে নিজেই প্লেটে খাবার উঠিয়ে দেয়। তারপর হাত পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করে। কোন কোন দিন নিজের হাতেই লুকমা বানিয়ে স্বামীর মুখে উঠিয়ে দিত। স্বামীর খানা শেষ হওয়ার পূর্বেই সে পান প্রস্তুত করে রাখত। খাওয়া শেষ হলে অতি সযত্নে স্বামীর মুখে এক খিলি পান তুলে দিত। পান খাওয়া শেষে স্বামী শুয়ে পড়লে আজীজা পাশে বসে মাথায় হাত বুলাতে থাকতো এবং হাত পা দাবিয়ে

দিত। মোট কথা, স্বামীর আরামের জন্য এবং তার হৃদয় জয় করার জন্য যত কিছু করা দরকার তার সবই সে জান প্রাণ দিয়ে করার চেষ্টা করতো। এভাবেই চলতে লাগলো আজীজার জীবন।

একদিন স্বামীর মনের অবস্থা ভাল দেখে ভয়ে ভয়ে আজীজা বললো, ওগো আমার কলিজার টুকরা! যদি আপনি কিছু মনে না করেন এবং ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে একটি কথা বলতে চাই।

স্বামী ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই বলবে। তাতে মনে করার কি-ই বা আছে?

স্ত্রী ঃ না, কথা তো তেমন কিছু না। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ঘরের বাইরে পুরুষদের হাজারো কাজ থাকে। এজন্য দিনভর তাকে বাইরে কাটাতে হয়। পুরুষরা মেয়েদের ন্যায় ঘরকুনো হয়ে বসে থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যা হলো, অনেক রাত পর্যন্ত আপনি না আসার কারণে একা একা আমার ভয় ভয় লাগে।

স্বামী ঃ সারাদিন আমার দম ফেলবার সময় থাকে না। আর রাতের বেলায় বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠি। বারবার চেষ্টা করি সকাল সকাল ঘরে ফেরার। কিন্তু তারা আমাকে ছাড়তেই চায় না। দাবা, পাশা, তাসের মধ্যে এমনভাবে ডুবে যাই যে. কোন দিক দিয়ে রাত ১টা/২টা বেজে যায় তা টেরই পাই না। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আমার কারণে তোমাকে অপেক্ষা করার কষ্ট সহ্য করতে হয়। ইনশাআল্লাহ, আগামী কাল থেকে আমি সকাল সকাল আসার চেষ্টা করবো।

স্ত্রী ঃ (হাসি মুখে) আল্লাহ আপনার ইচ্ছা পূরণ করুন।

ব্যাস, কথা এখনেই শেষ। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন কথাই সে বলেনি। ফল এই দাঁড়াল যে, সে এখন রাত ৯ টার মধ্যে প্রতিদিন বাসায় ফিরে আসে।

প্রিয় পাঠক! দেখলেন তো! আজীজার কথা কিভাবে ফলপ্রসু হল? প্রকৃত পক্ষে স্বামীর মন জয় করে সময় সুযোগ বুঝে বুদ্ধিমত্তার সাথে কিছু বললে তা সহজেই বাস্তবায়িত হয়ে যায়।

বাইরে পুরুষরা কোথায় কি করে বা না করে তা অবশ্য

মেয়েদের জানার কথা নয়। তবে স্বামীর ভাব ভঙ্গি ও কাজের গতিবিধি দেখে অনেক সময় প্রকৃত অবস্থা কিছুটা আঁচ করা যায়। আজীজার বেলায়ও তাই হল। সে দেখল, তার প্রতি স্বামীর না আছে সন্তুষ্টি, না আছে আসক্তি। কিছুদিন পর সে এ সংবাদও পেল যে, তার স্বামী কিছু উচ্ছৃংখল যুবকের ফাঁদে পড়ে জীবন-যৌবন সব কিছু ধ্বংস করছে। সিনেমা, থিয়েটার, সার্কাসসহ প্রভৃতি খেল-তামাশায় শরীক হচ্ছে। মাঝে মাঝে পতিতালয়েও গমন করছে। ছোট খাট চুরি চামারী করতেও সে দ্বিধাবোধ করছেনা। এসব বিষয় আজীজাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলছে।

বুদ্ধিমতি আজীজা প্রথম পর্যায়ে যখন সফল হল অর্থাৎ রাত ১টা/ ২টার পরিবর্তে স্বামীকে ৯টার মধ্যে বাসায় ফিরাতে সক্ষম হল তখন তার বিশ্বাস জন্মাল যে, ইনশাআল্লাহ আমি ধীরে ধীরে তাকে অন্যসব খারাপ কাজ থেকেও ফিরাতে সক্ষম হবো।

আজীজা সুযোগের সন্ধানে রইল। সে জানত, অসময়ে কথা বললে তা যেমন বৃথা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক তেমনি একবারে কঠিন চাপ প্রয়োগ করলেও স্বামীর ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যাবে। তখন কোন কিছুই কাজে আসবে না। তাই গুণবতী আজীজা ভুলেও অভিযোগমূলক কোন কথা মুখে আনত না। স্বামীর সকল কর্মকান্ডের খবরাখবর নিশ্চিত ভাবে জেনেও সে এমন সহজ সরল ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতো যেন সে কিছুই জানে না।

এবার সে খেদমত ও ভালবাসার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। একদিন সে সুযোগ বুঝে বলল, প্রাণপ্রিয় স্বামী আমার! আপনার চারপাশে যে সকল বন্ধু-বান্ধব আছে তারা কেউই কিন্তু প্রকৃত বন্ধু নয়। তারা হলো সু সময়ের বন্ধু । আপন স্বার্থ হাসিল করা এদের মূল উদ্দেশ্য। খোদা না করুন, যদি আপনি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হন তবে এসব সুযোগ সন্ধানী নাম সর্বস্ব বন্ধুরা আপনাকে ছেড়ে চলে যাবে। এতে মোটেও সন্দেহ নেই। আমার কথাগুলো আপনার হয়তো ভাল নাও লাগতে পারে। কিন্তু কি করব বলুন। আমি যে আপনার স্ত্রী। আর কোন স্ত্রী কখনোই তার স্বামীর অকল্যাণ দেখে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে পারে না।

প্রিয়তম স্বামী আমার! আপনি একজন শিক্ষিত, বিচক্ষণ ও বিবেকবান পুরুষ। আপনার সারাটা জীবন জ্ঞানার্জনের মধ্যে কেটেছে। আপনার মত একজন শিক্ষিত ভদ্র লোকের পক্ষে নোংরা পরিবেশে গমন করা কি আদৌ শোভা পায়? লোকজন যদিও আপনার সামনে ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলে না, কিন্তু পিছনে তো কঠোর সমালোচনা করে। আমি মনে করি, আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য অবসর সময়টুকু বিভিন্ন বই পুস্তক অধ্যয়নে কাটিয়ে দেয়া উচিত। এতে একদিকে যেমন আপনার মন প্রফুল্ল থাকবে তেমনি অন্য দিকে আপনি প্রভূত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

প্রেমাস্পদ আমার ! আমি আপনার স্ত্রী। সুতরাং আমার চেয়ে বেশী হিতাকাংখী ও কল্যাণকামী আপনার আর কে-ইবা হতে পারে? এসব কথা আপনার, আমার ও পরিবারের সকলের কল্যাণের জন্যই আমি বলছি। অবশ্য আমি এও বলি না যে, রাতদিন আমার কোমর ধরে বসে থাকতে হবে। বাইরে বের হওয়াই যাবে না। যে এরূপ বলে সে পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন প্রয়োজন কিংবা শারীরিক সুস্থতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্ত বাতাসে ভ্রমন করা অবশ্যই প্রয়োজন । তবে তা হবে নিয়মিত ও পরিমিত। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়।

স্ত্রীর এই জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে স্বামী খুব খুশি হল। তবে মনে মনে চরমভাবে লজ্জিত হল। সেই লজ্জা ও অনুতাপের ছাপ তার চেহারায় পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। ভাবল, আমার স্ত্রী যা কিছু বলল তার সবই তো এক'শ ভাগ সঠিক। আমি একজন শিক্ষিত যুবক হয়ে কেন এসব নোংরা কাজে লিপ্ত থাকব? আমার জন্য তো এসব কাজ মোটেও শোভা পায় না। আজীজার মত এমন সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী থাকতে আমি কেন বস্তির পতিতাদের কুটিরে আসা যাওয়া করব? আমি তো সত্যিই মহাঅন্যায় করছি। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর এসব কাজের প্রতি তার চরম ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হল। সাথে সাথে প্রতিজ্ঞা করল, যেসব বন্ধু আমার জীবনকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে উপনীত করেছে, যে কোন উপায়ে তাদের সংশ্রব থেকে আমাকে দূরে থাকতেই হবে। আজীজাই আমার পরম হিতাকাংখী ও শুভাকাংখী স্ত্রী।

তাকে নিয়েই আবার আমি জীবনের নতুন অধ্যায় আবার শুরু করব। অসংখ্য ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ প্রিয়তম আজীজাকে।

এরপর থেকে আজীজার স্বামী ধীরে ধীরে এসব স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের পরিত্যাগ করে দ্বীনদার যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব করল। এবং পূর্বের যাবতীয় অন্যায়-অপকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমন এক নব জীবনের সূচনা করল যা সকলকেই অবাক করে দিল। লোকেরা বুঝতেও পারল না যে, কিভাবে সে একজন সত্যিকারের মুসলমানে পরিণত হল। কিভাবে তার জীবনে এত বড় পরিবর্তন আসল।

সে এখন আজীজাকে প্রাণভরে ভালবাসে। তাকে ছাড়া তার কিছুই ভাল লাগে না। এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। আজীজা কাছে না থাকলে সবই অর্থহীন মনে হয়। ভাবে, আজীজাই হৃদয়ে পুঞ্জিভূত সমস্ত প্রেম-ভালবাসা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তার ধ্বংস প্রায় জীবনকে সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। আজীজার ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সে এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করে। যাবতীয় ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলে। ধর্মীয় জীবন যাপনের মধ্যে যে কি মজা, স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে তা এখন সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ধর্মীয় জীবন আর ধর্মহীন জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য তাও সে বুঝতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, অবশেষে দু'জনে মিলে গোটা পরিবারের সকল সদস্যকেও ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্থ করতে সক্ষম হয়েছে। একটি মেয়ের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, নিষ্ঠা, সহমর্মিতা ও বিরামহীন প্রচেষ্টা যেমন তাদের দাম্পত্য জীবনে শান্তির ফল্গুধারা বয়ে এনেছে, ঠিক তেমনি একটি পরিবারও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সবাই এখন ইজ্জত সম্মান ও শান্তির মুখ দেখতে পেরেছে।

উক্ত ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, খোদা না করুন, দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন মা-বোনের স্বামী আজীজার স্বামীর মত হয় তবে তাকেও একই পথ অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ বিরোধিতা, কঠোরতা, কর্কশতা, অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পথ পরিহার করে নম্রতা, ভদ্রতা, সেবা, সহমর্মিতা ও

বিচক্ষণতার মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আমার বিশ্বাস, স্ত্রী যদি এ ব্যাপারে আন্তরিক হয়, তাহলে তা একশ ভাগ সম্ভব। মনে রাখবেন, শাসন করে কখনোই পুরুষকে সঠিক পথে আনতে পারবেন না। এতে উপকারের চেয়ে অপকারই হবে বেশী। পুরুষের মেজাজ মাফিক কথা না বলা আর সাপ নিয়ে খেলা করা একই কথা। এটা কোন হাসির কথা নয়। বরং চিরন্তন সত্য কথা। আল্লাহ তায়ালা সকল মা-বোনদের এ নিরেট সত্য কথাটি বুঝে তদানুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❐

মাকে কষ্ট দেওয়ার নির্মম পরিণতি

আনিস নামের এক ভদ্রলোক। হবিগঞ্জ জেলার ওলিপুরে তার বাড়ী। নানার বাড়ী রানীগঞ্জ। নানা-নানীকে দেখার জন্য প্রায়ই তিনি রানীগঞ্জ যান। যাতায়াতের পথে সুস্থ সবল ও সুঠাম দেহের অধিকারী একজন লোককে অনেক বার তিনি দেখেছেন। বারবার দেখতে দেখতে লোকটির চেহারা একদম মুখস্থ হয়ে গেছে।

গ্রীষ্মের দুপুর। প্রচন্ড গরমের কারণে নারী-পুরুষ শিশু-কিশোর সকলেই অস্থির হয়ে পড়েছে। অসহ্য গরম থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়ার জন্য আনিস সাহেব বাঁশ ঝাড়ের নীচে একটি চেয়ারে বসে দক্ষিণা হাওয়া খাচ্ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন, কুচকুচে কালো, সীমাহীন পর্যায়ের বদসূরত একটি লোক তার জীর্ণ-শীর্ণ দেহটি নিয়ে পাশের রাস্তা ধরে এদিকেই আসছে। লোকটির মাথায় উস্কুখুস্কু চুল। পরণে একটি ছেঁড়া লুঙ্গি। গায়ে ধুলোবালি মাখানো একটি জামা। একটি চোখ অন্ধ। লাল টকটকে অপর চোখটি দিয়ে অনবরত অশ্রু রাশি ঝরে পড়ছে। ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে দেহের দগদগে ঘাগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পায়ে একটি বড় ঘা। তাতে কয়েকটি মাছি বসে আছে। কঞ্চির মতো চিকন হয়ে যাওয়া নষ্ট ডান হাতটি দিয়ে মাছিগুলো তাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে। সব মিলে অদ্ভুত ভয়ংকর বীভৎস মানুষটি।

লোকটিকে দেখে এ দিন দুপুরে কেমন যেন ভয় হতে লাগলো আনিস সাহেবের। কি ভয়ংকর একখানা চেহারা। অথচ গায়ে শক্তি আছে বলে মনে হয় না।

আনিস সাহেব লোকটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন তাকে অনেকবার দেখেছেন। কিন্তু লোকটিতো তখন এমন বিশ্রী ছিল না। তিনি তো তাকে সুস্থ সবল দেখেছিলেন। ধীরে ধীরে তার মনে পড়ল, নানার বাড়ী রানীগঞ্জ যাতায়াতের পথে লোকটাকে তিনি অনেক বার দেখেছেন।

ভয়ংকর কুৎসিত এ লোকটি তার কংকালসার দেহটি নিয়ে আর সামনে এগুতে পারছে না। হঠাৎ দপ করে বসে পড়ে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে। জিহ্বাটা অনেক দূর বাইরে বের হয়ে এসেছে। শ্বাস নেওয়ার সময় শরীরের রগগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

এ দৃশ্য দেখে আনিস সাহেবের মনে হাজারো প্রশ্ন জেগে উঠল। চিন্তার অথৈ সাগরে হারিয়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন, যে লোকটি একসময় সুস্থ, সবল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল, আজকে তার এই দুরবস্থা কেন? কেন তার প্রতি মানুষ চোখ উঠিয়ে তাকাতেও ঘৃণাবোধ করে? কেন তার এই নির্মম পরিণতি? তাহলে কি সে এমন কোন পাপ করেছে যার কারণে তার এই করুণ অবস্থা? হয়তো বা তা-ই হবে।

লোকটির আরেকবার কঁকিয়ে উঠার আওয়াজে আনিস সাহেবের চিন্তায় ছেদ পড়লো। তিনি লক্ষ্য করলেন, লোকটি বাম হাত দ্বারা তার পেট চেপে ধরে বিড়বিড় করে বললো, মা! মাগো! আমায় ক্ষমা করে দাও। অনেক শাস্তি পেয়েছি মা! আর পারছিনে মা! আমায় মাফ কর।

পেটের প্রচন্ড ব্যথায় ছটফট করে লোকটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। দেহের ঘাগুলো থেকে রক্ত বেরিয়ে গায়ের জামাটি ভিজে যাচ্ছে।

আনিস সাহেব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটির জন্য তিনি কিছু করবেন এমন শক্তি সাহসও যেন তিনি

হারিয়ে ফেলেছেন। ভয়ংকর বীভৎস লোকটির কাছে যেতেও তার ভয় লাগছে। এক পর্যায়ে তিনি একটু সাহস সঞ্চয় করে লোকটির কাছে গিয়ে নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! কি হয়েছে আপনার? এমন করছেন কেন? জবাবে লোকটি একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু জোর গলায় বললো, কিছুই হয়নি আমার। এটা আমার প্রাপ্য। আমার পাপের ফসল। মায়ের অভিশাপ। মায়ের উপর আমি যে অবিচার করেছিলাম এটি তারই শাস্তি। একটু দম নিয়ে লোকটি চিৎকার করে বললো, মা! আমাকে মাফ করে দাও মা! আমাকে মাফ কর।

একটু পরে লোকটি কিছুটা শান্ত হল। সে সোজা হয়ে বসে আনিসের দিকে তাকিয়ে বড় করুণ কণ্ঠে বললো, বাবা! আমাকে চারটা খাবার দিতে পারবে?

ঃ কেন পারব না? আসুন আমার সাথে।

লোকটি উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। আনিস সাহেব তাকে ধরার জন্য হাত বাড়ালেন। লোকটি চেঁচিয়ে উঠে বললো, না না, তোমার পবিত্র হাতে আমার এই পাপ পংকিলময় শরীরটাকে স্পর্শ করো না।

ঃ পাপ করেছেন বলে তো শরীরে পাপ লেগে থাকে না।

ঃ থাকে থাকে! আমার আপাদমস্তক পাপে পরিপূর্ণ। আমি জঘন্য পাপী। আমার পাপ ক্ষমার অযোগ্য। দয়া করে তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

আনিস সাহেব তাকে স্পর্শ করলেন না। অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল লোকটা। বাড়ীতে এনে তাকে প্রচুর খাবার দিলেন আনিস সাহেব। ক্ষুধার্ত বুভূক্ষ মানুষ খাবার পেলে কেমন আগ্রহ নিয়ে গোগ্রাসে তা খেয়ে ফেলে আনিস সাহেব তা আজ বাস্তবে প্রত্যক্ষ করলেন। তার দেয়া অনেকগুলো খাবার লোকটা মুহূর্তেই খেয়ে সাবাড় করে দিল।

খাওয়া শেষ হলে আনিস সাহেব লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন- এখন কোথায় যাবেন?

ঃ কোথায় আর যাব! এই বিশাল পৃথিবীতে আমার কোথাও যাবার নেই। পৃথিবীর সবাই আমাকে ঘৃণা করে। আমার যাবার মাত্র একটাই জায়গা আছে, সেটা মাটির নীচে। কিন্তু সেখানে যেতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করেও পারছি না। হয়তো কবরও আমাকে জায়গা দিতে নারাজ।

ঃ কেন, আপনার বাড়ী ঘর নেই?

ঃ কিসের আবার বাড়ীঘর? পোড়া কপালের কি আর বাড়ী ঘর থাকে?

ঃ আপনার বাড়ী রানীগঞ্জ না? সেখানে তো আপনাকে অনেক দেখেছি। তখন তো আপনাকে ভাল দেখেছিলাম। এখন এমন হয়েছেন কেন? একটু খুলে বলবেন কি?

এবার লোকটার ভিতর থেকে আরেকটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। অশ্রু ভেজা সজল দুটো চোখ দিয়ে আমার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল-

ঃ ছিল, সবই ছিল। ঘর-বাড়ী, চাকর-নওকর, স্বাস্থ্য-সম্পদ কোন কিছুরই কমতি ছিল না আমার। কিন্তু এখন কিছুই নেই। এটা আমার পাপের ফল। মায়ের অভিশাপের নির্মম পরিণতি।

ঃ কি কারণে আপনার মা অভিশাপ দিলেন? দয়া করে একটু জানতে পারি?

ঃ না, বলা যাবে না। এতবড় নির্মম ও নিষ্ঠুর কাহিনী আমি বলতে পারবো না।

আনিস সাহেব একটু জোর গলায় বললেন, অল্প একটু বলুন না। আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করছে। হয়তো এ থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা নিতে পারবো।

ঃ আমি ক্ষমার অযোগ্য পাপী। মায়ের ক্ষমা না পেলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। আগুন। আগুন। জাহান্নামের প্রজ্বলিত আগুন আমাকে পুড়বার জন্য অপেক্ষা করছে। আহ! জাহান্নাম!! হাবিয়া দোযখ!!! ওমা! মাগো!! আমায় ক্ষমা করে দাও মা!

কিছুক্ষণ পর লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, শুনতে চাও? শুনতে চাও আমার জীবন কাহিনী?

ঃ হ্যাঁ, একটু বললে শুনতাম।

ঃ তাহলে বসো বলে লোকটি বলতে লাগলো-

আমার নাম মুকসেদ। বাড়ী এক সময় রানীগঞ্জেই ছিল। শুনেছি আমার জন্মের মাসখানেক পরেই নাকি আমার আব্বা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাই পিতাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। পৃথিবীতে এসে শুধু মাকে পেয়েছি। আমার আর কোন ভাই বোন নেই। মা আমার জন্য নাকি অনেক কষ্ট করেছেন। সংসারের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই দূর্বল। কষ্ট করে মা আমাকে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি মানুষ হতে পারিনি, শুধু একটা জানোয়ার হয়েছি।

মায়ের কষ্টার্জিত পয়সা দিয়ে একদিন রানীগঞ্জ হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি পাস করলাম। এ সংবাদ পেয়ে মা যে কত আনন্দিত হয়েছিলেন তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেদিন তিনি এক কেজি দুধ কিনে সবটুকুই আমাকে পান করতে দিলেন। দুধ পান শেষে মায়ের চেহারা পানে তাকিয়ে দেখি তার দু'গন্ড চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মা! তুমি কাঁদছ? মা বললেন, নারে! কাঁদছি না। এ যে আনন্দের অশ্রু। আপনা আপনিই গড়িয়ে পড়ছে। তোর বাবা যদি আজ বেঁচে থাকতেন তাহলে কতইনা খুশি হতেন।

মায়ের সেদিনের সেই আনন্দ মিশ্রিত মুখখানা আজও আমার মনে পড়ে। হৃদয়ে ঝড় উঠে। কাল বৈশাখী ঝড়। হু হু করে কেঁদে উঠে হৃদয়টা।

মা! আমার লক্ষী মা! আমি তার মর্যাদা বুঝতে পারিনি। আমি তাকে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছি। দুঃখ দিয়েছি। এই দেখছো না আমার ডান হাতটা কেমন অকেজো হয়ে গেছে? হবেই তো। যে হাত আপন মায়ের পিঠে আঘাত করে, সে হাত কি ভাল থাকতে পারে?

লোকটি অঝোরে কাঁদছে। লাল টকটকে চোখ থেকে

অশ্রুধারা মাটিতে ঝরে পড়ছে। গ্রীষ্মের খরতাপে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া মাটিগুলো তার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে যাচ্ছে।

লোকটি বলতে থাকল, এর মাস তিনেক পর আমার একটি চাকুরী হল। চাকুরী পাওয়াতে মা ভীষণ খুশি হলেন। আমিও অভাবী সংসারের কথা ভেবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকুরীতে যোগদান করলাম।

আমার সাথে আলেয়া নামের একটি সুন্দরী মেয়ে চাকুরী করত। সারাদিন কেটে যেত পাশাপাশি থেকে। এভাবে ধীরে ধীরে সে আমার মনের মনিকৌঠায় স্থান করে নিল। মাঝে মাঝে আমি তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসতাম। এতে মা ভীষণ রাগ করতেন। আপন সন্তান অন্য এক অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে ঘোরাফেরা করবে এটি মা কখনোই বরদাশ্‌ত করতে পারতেন না। কিন্তু আমি এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আলেয়ার সাথে আমার সখ্যতা আরও বাড়িয়ে দিলাম।

এর ঠিক এক বছর পর একদিন আমি মাকে না জানিয়ে আলেয়াকে বিয়ে করে বাড়ীতে নিয়ে এলাম। আমার এ অপ্রত্যাশিত কর্মকান্ডে মা অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। কষ্টের তীব্রতায় অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তারপর আমার দিকে মুখ করে চিৎকার দিয়ে বললেন, নিমক হারাম! বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে। আমি তোর পোড়া মুখ দেখতে চাই না।

ধীরে ধীরে পাড়ার অনেকেই এসে ভীড় জমাল। সবাই মাকে বুঝানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু মা কোন ভাবেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারলেন না। তখন থেকেই মায়ের সাথে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

এরপর তিনটি বছর চরম অশান্তিতে কেটে গেল। এরই মাঝে আলেয়ার সাথে মায়ের কতদিন যে ঝগড়া হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। যখনই ঝগড়া শুরু হত তখনই আমার সুন্দরী অহংকারী স্ত্রী মাকে চরমভাবে অপমান করত। কিন্তু আমি আলেয়ার রূপে এতটাই পাগল ছিলাম যে, কোনদিন তাকে কিছু বলার সাহস পাইনি। বরং উল্টো মাকেই বকাঝকা করতাম।

দু'চারটি কটু কথা শুনিয়ে দিতাম। তাতে মা যে কতটা কষ্টে চোখের পানি ফেলতেন, তা আজ পরিস্কার ভাবে উপলব্ধি করতে পারছি ।

হায় আফসোস! শত আফসোস আমার!! মাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার কারণে যেখানে মায়ের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আলেয়াকে শাসন করার প্রয়োজন ছিল সেখানে আমি তা না করে উল্টো মায়ের প্রতিই বিতৃষ্ণ হলাম। তাকেই সংসারের একটি জঞ্জাল মনে করলাম। এখন কারণে অকারণে আলেয়ার সাথে আমিও মাকে গালি দেই। বিভিন্ন প্রকার কুটুক্তি করে তার হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করি। এতে মা নীরবে অশ্রু ফেলেন। বার বার আঁচল দিয়ে চোখ মুছেন। কিন্তু তার এই অশ্রু আমার পাষাণ হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি।

এর ঠিক পাঁচ বছর পরের কথা। একদিন আমি অলিপুরের হাট থেকে বাড়ী ফিরে দেখি মায়ের সাথে আলেয়ার ঝগড়া চলছে। আলেয়া মাকে বিরামহীনভাবে গালিগালাজ করে চলছে। আলেয়ার প্রতি আমি এতটা দূর্বল ছিলাম যে, তার কোন দোষ আমার চোখে পড়তো না। মনে করতাম, সকল দোষ মায়ের।

বাড়ীতে ঢোকার সাথে সথে আলেয়া চেঁচিয়ে উঠে বললো, হয় এই ডাইনী বুড়িকে বাড়ী থেকে বের করে দাও, না হয় আমি চলে গেলাম। আলেয়ার কথায় আমার মাথায় খুন চেপে বসলো। রাগে, ক্ষোভে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করলো। তাই অন্যান্য দিনের মতো কোনরূপ যাচাই বাছাই না করে আজও মায়ের উপরই সকল দোষ চাপিয়ে দিলাম। আলেয়া দোষ করতে পারে- একথাও যেন আমি ভুলে গেলাম। তাই আলেয়া চলে গেলে আমার জীবন অনর্থক ভেবে মাকেই বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর দেরী নেই। সাথে সাথে মায়ের দিকে একবার চোখ লাল করে তাকিয়ে হাত দিয়ে খুব জোরে একটি ধাক্কা দিয়ে বললাম, এই বুড়ি! তুই এই মুহূর্তে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা।

আমার প্রচন্ড ধাক্কায় মা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু আমি তাকে টেনে উঠানোরও প্রয়োজন বোধ করলাম না। সুন্দরী স্ত্রী আলেয়ার ফাঁদে পড়ে আমি একথা ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আজ আমি যাকে গালমন্দ করলাম, যাকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম, তিনি তো আমার ঐ মা যিনি দীর্ঘ নয় মাস আমাকে তার পেটে ধারণ করেছেন, যিনি দুই বছর একাধারে স্বীয় দুগ্ধ পান করিয়েছেন, যিনি নিজের সকল প্রকার আরাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে আমার সুখের কথা চিন্তা করেছেন। তিনি তো আমার ঐ মা যিনি শৈশব কালে আমার প্রস্রাব-পায়খানা পরিস্কার করেছেন, যিনি আমার সুখে সুখী হয়েছেন দুঃখে দুখী হয়েছেন, যিনি আমার অসুস্থতার সময় রাতের পর রাত জাগ্রত থেকে আমার সেবা শশ্রুষা করেছেন এবং আমার রোগ মুক্তির জন্য খোদার দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন।

মাটিতে পড়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মা অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। এরপর হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্প দূরে ছিল মসজিদ। মা সেই মসজিদের দরজায় হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ সেখানে কাঁদলেন। তারপর হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চোখের পানি ফেলে দিয়ে বললেন-

'খোদা! তোমার কাছে আমি এর বিচার চাই। এত বড় অবিচারের বিচারক পৃথিবীতে নেই, তুমি এর বিচার করো খোদা! এরপর মা কোন দিকে চলে গেলেন জানি না।

মা যখন কেঁদে কেঁদে আমার জন্য বদদোয়া করছিলেন, তখন পাড়ার অনেকেই আমাকে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি অহংকার আর দর্প ভরে তখন বলেছিলাম, মায়ের অভিশাপে আমার কিছুই হবে না। মায়ের অভিশাপে ধ্বংস অনিবার্য এ সত্যটিকে সেদিন হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারিনি।

মা চলে যাওয়ার পর তার সাথে বেয়াদবীর ভয়ংকর শাস্তি

ধীরে ধীরে পেতে শুরু করলাম। যে আলেয়ার কারণে মাকে তাড়িয়ে সুখ স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। আজও তা পুরা হয়নি। হবেও না কোন দিন। আর সেই সংসার! সেই সংসারে কখন যে জাহান্নামের আগুন এসে প্রবেশ করেছে তা টেরও পাইনি।

পরে জানলাম, পাড়ার ওদিকে মা তার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! আলেয়ার কারণে আমি কোনদিন মায়ের খোঁজও নেইনি। তিনি কেমন আছেন, কিভাবে আছেন, তা জানারও প্রয়োজন অনুভব করিনি।

এর তিন মাস পর একই সাথে আমার ও আলেয়ার চাকুরী চলে গেল। তখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মায়ের অভিশাপই আমাদের চাকুরী যাওয়ার মূল কারণ। কেননা যে অভিযোগে আমাদেরকে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হল, সেই অভিযোগে আজ পর্যন্ত কারো চাকুরী যায়নি।

কয়েকদিন পর শুনলাম মা মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

তাই একদিন রাতের আধারে আলেয়াকে সাথে নিয়ে মাকে দেখতে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তার কাছে ক্ষমা চাইব।

ঘরের দরজায় গিয়ে আস্তে করে ডাকলাম, মা! দরজা খোলার পর ভিতরে গিয়ে দেখি, একটি কংকালসার দেহ নিয়ে মা সটান হয়ে পরের বাড়ীতে অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছেন। আমাকে দেখেই মা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। একটু পরেই দেখা গেল মা আর এ জগতে নেই। চলে গেছেন দূরে, বহু দূরে। যেখান থেকে মানুষ আর কোন দিন ফিরে আসে না। বড় হতভাগা আমি। মায়ের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাগ্যও হলো না। ইহকাল পরকাল দুটোই আমার নষ্ট হয়ে গেল।

আমাদের দু'জনের মধ্যে কারও চাকুরী না থাকার কারণে বাধ্য হয়ে আমাকে অন্যের জমিতে কাজ করতে হলো। কিন্তু তাও বেশীদিন সম্ভব হলো না। একদিন হঠাৎ করে আমার ডান হাতটা অবশ হয়ে গেল। চিকিৎসা করার মতো কোন টাকা পয়সা হাতে ছিল না। তাই বহু কষ্টে অর্জিত একটি জমি বিক্রী

করতে হল। চার/পাঁচ দিন পর একটি চোখ অন্ধ হয়ে গেল। সেই সাথে প্রচন্ড পেটের ব্যাথা। কয়েকদিন পর দেখা দিল হাঁপানি। এরপর সমস্ত দেহে ঘা উঠে গেল। আমি চিকিৎসার জন্য জমি-জমা, ঘর-বাড়ী, ভিটে-মাটি সবকিছু বিক্রি করে ফেললাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বরং ধীরে ধীরে আমার রোগের মাত্রা আরও বাড়তে থাকলো।

রোগের প্রচন্ডতায় আমার ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। তখন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করলাম। তাই বারবার খোদার নিকট মৃত্যুর জন্য ফরিয়াদ করলাম। কিন্তু মৃত্যু আমার ধারে কাছেও এলো না।

আমার টাকা পয়সা যেদিন সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেল সেদিন আলেয়া এসে আমাকে বলল, "আমি চলে যাচ্ছি।

আমি বললাম-

ঃ তুমি আমাকে এভাবে ফেলে চলে যাচ্ছ?

ঃ হ্যাঁ, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার এখানে থেকে তো আর ধুকে ধুকে মরতে পারি না?

ঃ আমার জন্য কি তোমার একটুও মায়া লাগছে না? আমাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে তুমি কিভাবে চলে যাওয়ার চিন্তা করছ? -আমার ভালবাসার প্রতিদান কি তুমি এভাবেই দিতে চাও?

ঃ কি করব আমি? যেখানে মাথা গুজবারও একটু ঠাঁই নেই। সেখানে থাকার দরকার কি? সেখানে থেকে আমার লাভই বা কি?

একথা বলে সে আমার হৃদয়ে শক্ত আঘাত দিয়ে সত্যি সত্যিই চলে গেল।

এবার আমি আরও বেশী অসহায় হয়ে পড়লাম। বিক্রিত বাড়ী থেকে একদিন খরিদ্দাররাও আমাকে বের করে দিল। গ্রামের কোন মানুষ আমাকে জায়গা দিল না। সবাই আমাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করলো। সকলেই দুর দুর করে আমাকে তাড়িয়ে দিল। সেই থেকে আজ দশ বছর যাবত আমি মায়ের অভিশাপ মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রিয় পাঠক! এটা কোন কাল্পনিক নাটক কিংবা বানানো কোন কাহিনী নয়। এটি একটি বাস্তব সত্য ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে যে সকল হতভাগা পৃথিবীতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, তাদের মতো লাঞ্ছনার জীবন আর কারো হয় না। দুনিয়াতেই তারা কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা তো রয়েছেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "আপনার পালনকর্তা নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে। যদি তোমার জীবদ্দশায় তাদের দু'জনের একজন অথবা উভয়েই বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে "উহ্" শব্দটিও বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচার পূর্ণ কথাবার্তা বলো। তাদের সামনে বিনয়ের বাহুকে অবনমিত করে দাও এবং বল, হে আমার পালন কর্তা! আপনি তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন যেমন তারা আমাকে শৈশব কালে লালন-পালন করেছেন।" (বনি ইসরাঈল আয়াত ঃ ২৩-২৪)

পিতা-মাতার হক্ব নষ্ট করার শাস্তি প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে বলেন, 'সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে দিবেন। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে দুনিয়াতেই দেয়া হয়। (বাইহাকী)

তিরমিযি শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত। এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! পিতা মাতার হক কি? তিনি বললেন, তারা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য ও সেবা-যত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাদের সাথে বেয়াদবী ও অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়। (ইবনে মাজা)

বাইহাকী শরীফে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে তার জন্যে জান্নাতের দুটি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে তার জন্যে জাহান্নামের দুটি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতা দুজনের মধ্য থেকে একজন থাকে তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের একটি দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এই শাস্তি বাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির উপর জুলুম করে? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, যদি পিতা মাতা সন্তানের প্রতি জুলুম করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। মোট কথা, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তারা জুলুম করলেও সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

অপর এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সেবা-যত্নকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সাওয়াব পায়। লোকেরা আরয করল, সে যদি দিনে ১০০ বার দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ ১০০ বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে এই সাওয়াব পেতে থাকবে। (বাইহাকী)

আল্লাহপাক সকল মুসলমান ভাই-বোনদেরকে পিতা-মাতার খেদমত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করতঃ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমিন॥ ❐

স্মরণীয় বাণী

তুমি যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করলে তা যদি তোমার বাস্তব জীবনে রূপায়িত করতে না পার তবে তুমি মস্তবড় বোকা।

-হযরত শেখ সা'দী (রহ.)

:-সূচীপত্র:-

রক্তাক্ত গুজরাট ঃ মানবতার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০০২ তারিখে ভারতের গুজরাট রাজ্যের গোধরা রেলস্টেশনে একটি পরিকল্পিত অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনায় ৫৮ জন হিন্দু করসেবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে পুরো গুজরাট রাজ্যে যে জঘন্য নারকীয় তান্ডবলীলা, ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা, নৃশংস গণধর্ষণ, বেপরোয়া অগ্নি সংযোগ ও লুন্ঠন সংঘটিত হয়েছে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা এক কলংকজনক অধ্যায়। মানুষ যে কত অভদ্র, ইতর ও জানোয়ার হতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল গুজরাটের এই গণধর্ষণ ও হত্যাকান্ড। এই সহিংসতায় প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হয়েছেন। এক লাখ মুসলমান হয়েছেন সহায় সম্পত্তি ও বাস্তুভিটা হারিয়ে উদ্বাস্তু-শরণার্থী। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতের উগ্রবাদী হিন্দু নরপশুরা গুজরাটের মুসলমানদের উপর যে অমানবিক ও বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানিয়েছে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্টগুলোতে তাদের উলঙ্গ পশুবৃত্তির নগ্ন রূপটা অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। নিম্নে এসব রিপোর্ট থেকে কয়েকটি উদাহরণ পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

১। সুলতানা নামের এক মুসলিম মহিলা। স্বামী ফিরোজ আহমেদ একজন টেম্পু ড্রাইভার। তিনি বলেন, গত ২৮ ফেব্রুয়ারী দুপুরে লম্পট ও বদমায়েশ হিন্দুদের হিংস্র থাবা থেকে আত্মরক্ষার জন্য ছেলে ফয়জানকে নিয়ে টেম্পুতে করে আমরা পালিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্বামী নিজেই চালকের আসনে ছিলেন। ইজ্জত লুন্ঠন ও মৃত্যু ভয় প্রতি মুহূর্তে আমাদের তাড়া করে ফিরছিল। ফয়জান আমার কোলেই ঘুমিয়েছিল। আমাদের টেম্পু 'কালোল' নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই একটি মারতী গাড়ী আমাদের পথ রোধ করে। সাথে সাথে কয়েকজন সশস্ত্র দুর্বৃত্ত আমাদের দিকে ছুটে আসে। তাদের দেখা মাত্রই এক অজানা আশংকায় আমার কলজেটা মোচড় দিয়ে উঠে। আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠি। আমার বুকফাটা চিৎকারে ফয়জানের ঘুম

ভেঙ্গে যায়। সেও হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে। কিন্তু আমাদের কান্না মানবরূপী পশুদের হৃদয়ে এতটুকু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। এক নরপশু আমার মাছুম বাচ্চাটিকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে মারে এবং কয়েকজন মিলে জোর পূর্বক আমাকে গাড়ীর বাইরে নিয়ে আসে।

অতঃপর তারা শত শত মানুষের সামনেই যাবতীয় পরিধেয় বস্ত্র খুলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ করে। তারপর শুরু হয় পাশবিক নির্যাতন। আমি তাদের কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি করে ইজ্জত রক্ষার আবেদন জানাই। কিন্তু এই উন্মত্ত হায়েনাগুলো আমার কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত না করে প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য মানুষের সামনে নৃশংস অপকর্মে লিপ্ত হয়। একের পর এক পালাক্রমে আমার ইজ্জত লুণ্ঠন করতে থাকে। জ্ঞান হারানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমি শিশু পুত্র ফয়জানের আম্মু আম্মু ডাকের করুণ কান্না শ্রবণ করেছি। দেখেছি, আমার স্বামীকে অসহায় অবস্থায় আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু হায়! তখন তার কিছুই করার মত সুযোগ ছিল না।

আমি তখন ভাবছিলাম, পশুরও একটা লজ্জা আছে। কুকুরের একটা লাজ-লজ্জা বোধ আছে। কিন্তু এসব নরপশুদের সে বোধটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। যারা আপন সন্তান ও স্বামীর সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে ধর্ষণের মহোৎসবে মেতে উঠতে পারে, তাদেরকে পশু কেন, পশুর চেয়ে অধম বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না।

এ নরাধমগুলোর অবস্থা এরকম ছিল যে, একজন অত্যন্ত পৈশাচিক কায়দায় তার সম্পূর্ণ যৌন লিপ্সা চরিতার্থ করার পর আরেকজন হায়েনার মত আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এভাবে তিন জন পর্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল। এরপর আমি কিছুই বলতে পারিনি। জানি না, এরপরও নরপশুগুলো কতক্ষণ তাদের এই নৃশংস তান্ডব চালিয়েছিল। জ্ঞান ফিরার পর দেখি, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। আমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে রক্ত ঝরছে। উপস্থিত লোকজন বলল, এ দুর্বৃত্তগুলো যাওয়ার সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে গোড়ালী কেটে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

২। গত ৩ মে ২০০২ তারিখে ঢাকার একটি দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় **'গুজরাট ট্রাজেডিঃ নারীর সম্ভ্রমহানীর কিছু হৃদয় বিদারক ঘটনা'** শিরোণামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই সংবাদে একটি তথ্য অনুসন্ধানী দলের বরাত দিয়ে যে মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার নিন্দা করার ভাষা আমাদের জানা নেই।

উল্লেখিত সংবাদের শুরুতেই একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে–

ষোল বছরের মেহেরুন্নেসা। ওরা তাকে আমার সামনেই নগ্ন করল। তারপর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হায়েনার মতই। মেয়েদের ওরা ধর্ষণ করল প্রকাশ্য রাস্তায়। দেখলাম, ধর্ষণ শেষে একজন মেয়ের যৌনাঙ্গ ওরা ফালি ফালি করে কাটল। তারপর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারল।

৩। উক্ত রিপোর্টের অন্যত্র ১৩ বছরের বালক আজহার উদ্দীনের জবানবন্দী উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

হুসাইন নগরের বাসিন্দা ফারজানা। আমি গুচ্ছু ও ছারাকে দেখেছি ফারজানাকে ধর্ষণ করতে। ধর্ষণের পর তারা ফারজানার পাকস্থলিতে অত্যন্ত নির্মমভাবে একটি ধারাল রড ঢুকিয়ে দেয়। তারপর তাকে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে হত্যা করে।

৪। উসমান নামক এক মুসলমান বলেন, একদল উন্মত্ত দুর্বত্ত আমাদের এলাকায় এসে মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে গণধর্ষণ শুরু করল। তন্মধ্যে আমার ২২ বছরের একটি মেয়েও ছিল যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তারা আমার পরিবারের সাত সদস্যকে পুড়িয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আমার বড় মেয়ে, যে পরে হাসপাতালে মারা গিয়েছে সে আমাকে মৃত্যুর পূর্বে বলে গেছে, আব্বু! আমাদের যারা ধর্ষণ করেছে, তাদের পরণে শার্ট ছিল। ধর্ষণ শেষে তারা প্রথমে শক্ত রড দিয়ে আমার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। তারপর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়।

৫। পত্রিকায় প্রকাশিত এ রিপোর্টের অন্য এক স্থানে আরেক ব্যক্তির জবানবন্দীতে বলা হয়েছে– উগ্র হিন্দুদের ভয়ে আমরা যে যেদিকে পারি, দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু তারা আমাদের কয়েক

জনকে ধরে ফেলে। তন্মধ্যে রোকেয়া, শাবানা ও সুহানা নামক আমার তিন মেয়েও ছিল। পাষণ্ডরা তাদেরকে, আমার সামনেই পালাক্রমে ধর্ষণ করে। তারপর এ নরপশুদের একজনকে বলতে শুনলাম, "ওদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল। মুসলমানদের কোন চিহ্নই রাখা যাবে না।" তা-ই করা হল। তারা আমার মেয়েগুলোকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে টুকরো টুকরো করে হত্যা করল। তারপর সবগুলো টুকরো একত্রিত করে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! একথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বিশ্বের তথাকথিত মানবতা ও ধর্ম নিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী হিন্দু-খৃষ্টান-ইহুদী গোষ্ঠীর ত্রিমুখী ষড়যন্ত্র ও যৌথ সাঁড়াশি আক্রমনের কালো থাবায় মুসলিম বিশ্ব আজ চরম হুমকীর সম্মুখীন। নিশ্চিহ্ন হচ্ছে মুসলিম অধ্যুষিত জনপদ। জানমাল ইজ্জত সম্মান হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান।

খৃষ্টান-ইহুদী চক্রের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ফলে মুক্তিকামী ফিলিস্থিনীদের স্বাধীনতা যখন ভূলুণ্ঠিত, সমগ্র বিশ্বকে বোকা বানিয়ে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন গোটা আফগানিস্তানকে অগ্নিকুন্ডে পরিণত করেছে, নারী-পুরুষ শিশুদের নির্বিচারে হত্যা ও ধর্ষণ যখন কাশ্মীরের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, গুজরাটে যখন চালানো হল ইতিহাসের বর্বরতম নৃশংসতা, ঠিক তখনই রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র থাকার অভিযোগে পূণ্যভূমি ইরাকের উপর চাপিয়ে দেয়া হল অন্যায়-অসম যুদ্ধ। সুতরাং এখনই যদি সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে কাফেরদের কালো হাতকে ভেঙ্গে দিতে না পারে তাহলে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, আমাদের সামনে আরো অনেক ভোগান্তি রয়েছে। আরও অনেক প্রশস্ত রক্তের সাগর আমাদেরকে পাড়ি দিতে হবে। তাই আসুন, দেরী না করে আমরা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা জোরদার করি। জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হই এবং মহান আল্লাহর দরবারে এজন্য কায়মনোবাক্যে দোয়াও করি। আল্লাহ আমাদের এক ও নেক হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন। ❐ (সূত্র ঃ রক্তভেজা গুজরাট)

সচেতন হও, মুসলিম জাতি!

পহেলা এপ্রিল ১৪৯২ সাল। যেদিন রচিত হয়েছিল মুসলমানদের ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করার এক জঘন্যতম ইতিহাস। মুসলমানদের ঠকানোর বিভৎস এক লোমহর্ষক কাহিনী। বিশ্ব বিখ্যাত মুসলিম বীর তারিক বিন যিয়াদ কর্তৃক অধিকৃত স্পেনের মাটিতে সেদিন ঘটেছিল মানব ইতিহাসের এক কলংকময় বর্বর হত্যাকান্ড। এই হৃদয়বিদারক, মর্মান্তিক ও নিষ্ঠুর ধোকাবাজিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য অসভ্য কাফেররা প্রতি বছর পহেলা এপ্রিলে পালন করে 'এপ্রিল ফুল' উৎসব। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কাফের গোষ্ঠীর তালে তালে আত্মভোলা মুসলিম জাতিও এপ্রিলের এই জঘন্য প্রথা পালন করে প্রকারান্তরে নিজের গালে নিজেই চপেটাঘাত করছে।

ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েমের যে বাধভাঙ্গা জোয়ার উঠে ইউরোপের মাটিও সেই জোয়ারে প্লাবিত হয়। ৭২২ খৃষ্টাব্দে মুসলিম সেনাপতি তারিক বিন যিয়াদ মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে স্পেনের রাজা রডারিকের লক্ষাধিক সৈন্যকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন এবং মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তন করে সেখানে ইসলামের ঝান্ডা উড্ডীন করেন।

মুসলমানদের নিরলস প্রচেষ্টায় স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে। একটানা দীর্ঘ আটশত বৎসর অব্যাহত থাকে এ উন্নতির ধারা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পরবর্তী মুসলিম শাসকদের শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে বিলাসিতা ও নৈতিক অধঃপতনের প্রেক্ষিতে ১৪৯২ সালের মধ্যেই মুসলিম শাসনে পতনের কালো-ছায়া নেমে আসে। মুসলমানরা ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে ভুলে যায় কুরআন ও হাদীসের অমূল্য শিক্ষা। নৈতিক অবক্ষয় ও অনৈক্য ধীরে ধীরে চতুর্দিক থেকে তাদের গ্রাস করে নেয়।

এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে খ্রীষ্টান জগত। তারা বিভিন্ন প্রকার ভয়ানক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন মূল্যে স্পেনের মাটি থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করতেই হবে। এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য পর্তূগীজ রানী ইসাবেলা চরম মুসলিম বিদ্বেষী পার্শ্ববর্তী খ্রীষ্টান সম্রাট ফার্ডিনেন্ডকে বিয়ে করে। এবার উভয়ে মিলে যৌথবাহিনী গঠন করার পর পুরোদমে মুসলিম উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। তারা হাজার হাজার নারী পুরুষ ও শিশুকে নির্বিচারে হত্যা করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয়। এভাবে তারা একের পর এক স্পেনের অধিকাংশ এলাকা দখল করে রাজধানী গ্রানাডার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে।

এবার শুরু হয় নিষ্ঠুরতার নতুন পর্যায়। খ্রীষ্টান যৌথবাহিনী ফার্ডিনেন্ডের নির্দেশে প্রথমে গ্রানাডার আশে পাশের শস্য খামার গুলো জ্বালিয়ে দেয়। পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় শহরে খাদ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র ভেগা উপত্যকা। ফলে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রানাডার মুসলমানগণ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে নিপতিত হয়। দুর্ভিক্ষ যখন প্রকট আকার ধারণ করল তখন প্রতারক ফার্ডিনেন্ড ঘোষণা করলঃ

"মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয় তবে বিনা রক্তপাতে তাদের সবাইকে মুক্তি দেয়া হবে।"

দুর্ভিক্ষতাড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও শিশুদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসঘাতক ফার্ডিনেন্ডের কথা বিশ্বাস করে শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং সকলকে নিয়ে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদে আশ্রয় নেয়।

যৌথবাহিনী প্রধান ফটক দিয়ে পঙ্গপালের মতো শহরে প্রবেশ করে এবং মুসলমানদেরকে মসজিদের ভিতর আটকে রেখে বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এরপর গ্রানাডার আকাশ যে নৃশংস বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছিল, তা শুনলে যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষও বোধ হয় আঁতকে উঠে বলবে, মানুষ কি মানুষের সাথে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করতে পারে? পারে কি মুক্তির আশ্বাস দিয়ে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে?

যাহোক, কুখ্যাত খৃষ্টান সম্রাট স্পেনের মাটিকে সম্পূর্ণ মুসলিম মুক্ত করার জন্য ভয়ংকর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দিল, তারা যেন একযোগে মুসলমান ভর্তি মসজিদগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সম্রাটের নির্দেশ পালন করে হিংস্র হায়েনাগুলো বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ে। সেদিন সাত লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু বুকফাটা আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় দগ্ধ অসহায় মুসলমানদের আর্ত-চিৎকারে যখন গ্রানাডার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠল তখন নিষ্ঠুর সম্রাট ফার্ডিনেন্ড আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলেছিল, "Oh! Muslim How Fool you are." হায় মুসলমান, তোমরা কতই না বোকা! সেই থেকে খৃষ্টান জগত প্রতি বছর পহেলা এপ্রিল আড়ম্বরের সাথে পালন করে আসছে।

"এপ্রিল ফুল" মানে এপ্রিলের বোকা। যেহেতু মুসলমানগণ বোকামী করে খ্রীষ্টানদের সাজানো ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের ধ্বংসকে তরান্বিত করেছিল তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! প্রতারণার ফাঁদে ফেলে সাত লক্ষ মুসলমানের উপর খৃষ্টানরা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, ইতিহাসে তার দ্বিতীয় কোন নযীর আছে কি? এতবড় হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক ঘটনা পৃথিবী কখনও প্রত্যক্ষ করেছে কি? এর উত্তরে এক বাক্যে 'না'-ই বলতে হবে।

আমাদের ভাবতেও অবাক লাগে, যে দিনটির সাথে মুসলমানদের নির্মমভাবে হত্যা করার এতবড় একটি মর্মান্তিক ঘটনা জড়িত, বিজাতীয়তের সাথে তাল মিলিয়ে মুসলমানরাও কিভাবে এ দিবসটি পালন করে? কোন বিবেকবান মানুষের জন্য কি এটা কখনো সম্ভব হবে যে, সে তার পিতার মৃত্যু দিবসে আনন্দ উল্লাস করবে? পিতার মৃত্যু দিবস যদি আনন্দ ও খুশীর মাধ্যমে পালন করা বোকামী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হয়, তাহলে "মুসলিম গণহত্যার মর্মান্তিক দিবস" আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে পালন করা কি বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে?

তাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছি, হে আত্মভোলা মুসলিম জাতি! সচেতন হও। সজাগ হও। ইতিহাস জান। সচেষ্ট হও, মুসলমানদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে। জাগো, ঘুমিয়ে থাকার আর সময় নেই। কুফুরী শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়। নইলে তোমাদের জন্য আরও লাঞ্ছনা ও অপমান অপেক্ষা করছে।

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা যখন জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে জিহাদী জযবা দান করুন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী সকল কুফরী শক্তির দাঁতভাঙ্গা সমুচিত জবাব দেওয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন। ❐

মুসলিম কিশোরীর আশ্চর্য প্রতিশোধ

ন'বছরের এক কিশোরী। আফগানিস্তানের মাটিতে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার আলো-বাতাসেই একটু একটু করে বড় হয়েছে। তার চোখ-মুখ থেকে যেন প্রতিশোধের অগ্নি-স্পৃহা ঠিকরে পড়ছে। পাষাণ হৃদয় রুশ সেনারা যেদিন তার পিতা-মাতাকে তারই সামনে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল; যেদিন তারা তার একমাত্র মাথাগুজার ঠাই প্রিয় ঘরটিকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্মিভূত করেছিল, সেদিন থেকেই প্রতিশোধের আগুন তার অন্তরে দাউ দাউ করে জ্বলছিল।

কিশোরী অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছিল কখন আসবে প্রতিশোধ গ্রহণের শুভক্ষণ। দিন যায় রাত আসে। রাতের পর আবার শুরু হয় দিন। কিন্তু তার অপেক্ষার পালা শেষ হয় না। তার মনে শুধু একটিই প্রশ্ন, কেন- কেন বেঈমান কাফেররা অন্যায়ভাবে আমার মাতৃভূমি দখল করল? কেন তারা আমার ফলের বাগান নষ্ট করল, কেন তারা আমার ঘরটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল, কেন তারা আমার প্রাণপ্রিয় আব্বা আম্মাকে নিষ্ঠুর

নির্যাতনে শহীদ করল? কি অপরাধ ছিল আমার? কি অপরাধ ছিল আমার পিতা মাতার?

'আমরা মুসলমান' তাহলে এটাই কি আমাদের একমাত্র অপরাধ? হ্যাঁ, তাদের দৃষ্টিতে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ যে, আমরা মুসলমান। আমরা কালেমা পড়ি। সত্যের কথা বলি। তারা জানে, মুসলমানই একমাত্র জাতি, যারা সকল বেঈমান কাফেরদের সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে একমাত্র অন্তরায়, একমাত্র বাধা। তাই মুসলমানদের কল্যাণ কখনোই তারা চায়নি, চাইবেও না।

কিশোরীর হাতে একটি ক্লাসিনকভ। প্রতিশোধের অদম্য আগ্রহ নিয়ে সে পাহাড়ে চড়লো। তার দৃঢ় প্রত্যয় হল, আমার এই ক্লাসিনকভটা দিয়ে পাষন্ড ও বর্বর রুশ সেনাদের একজনকে হলেও আমি জাহান্নামে পাঠাব। বদলা আমি নিবই। জীবনের বিনিময়ে হলেও।

কিশোরী তার অস্ত্র হাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হঠাৎ সে দেখলো, রুশ সেনাদের শক্তিশালী ট্যাংক বহর উঁচু নিচু অসম পথ অতিক্রম করে উদ্ধত ভাব নিয়ে অগ্রপ্রতিরোধ্য গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। চলন্ত ট্যাংকগুলোর কানফাটা আওয়াজ ও সেনাদের বিজয় উল্লাস আশে পাশের পাহাড়গুলোকে কাঁপিয়ে তুলছে। সকলের অগ্রভাগে কাস্তে হাতুড়ে আঁকা লাল পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে।

তাদের এতটা নির্ভীক হওয়ার কারণ হল, তারা খবর পেয়েছে যে, বর্তমানে এ এলাকাটি জনমানব শূণ্য। কোন মানুষ এখানে নেই। গত কিছুদিন পূর্বে লাল পতাকা উড়িয়ে এখানে যারা এসেছিল তাদের বিশালকায় ট্যাংকগুলো স্পন্দিত জীবনের কলকাকলীতে মুখর এই জনপদটিকে মাটির সাথে গুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংসের জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাছাড়া রাস্তা ঘাটের জীর্ণ দশা, বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী ও ভুতরে পরিবেশ এরই সাক্ষ্য বহন করছে।

অতএব যেখানে কোন শত্রু নেই, প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়ার কোন আশংকাই নেই, সে স্থান দিয়ে বীরদর্পে নির্ভীক

চিত্তে চলতে বাধা কোথায়? কে ঠেকায় তাদের অগ্রযাত্রা?

তারা উত্তাল তরঙ্গের মত মাতাল হয়ে দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। ভাবখানা এমন যে, তাদের অগ্রযাত্রা যেন কেউ রুখতে পারবে না।

কিন্তু হঠাৎ সামনের পাহাড় থেকে বুলেটের আওয়াজ ভেসে এল। তারা থমকে দাড়াঁলো। ভয়ে সকলেই থর থর করে কাঁপতে লাগলো। এমন একটা পরিস্থিতির জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত।

বুলেটের নির্মম আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে তরতাজা ক'টি প্রাণ। একটি বুলেটও ফাঁকা যায়নি। প্রতিটি বুলেট অব্যর্থ নিশানা হয়ে এক একটি বুক এফোড়-ওফোর করে অনতিদূরে লুকিয়ে গেলো।

গুলির ঝাঁক কোন্ দিক থেকে এসেছে তা নির্ণয় করতে না পেরে বোকা রুশ বাহিনী বৃষ্টির মতো গোলা বর্ষণ শুরু করলো। তাদের নিক্ষেপিত ভারী ভারী সেলগুলো চারিদিকে জাহান্নামের দাহ সৃষ্টি করছে। বিরাট জনপদটার যে দু'চারটি ঘরবাড়ী ধ্বংসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তাও মাটির সাথে মিশে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ যাবত বুলেট আসছে না। তারা ভাবছে, এতক্ষণে হয়তো আক্রমনকারী গোলার আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাদের শরীরের সবটুকু রক্ত এখানকার তৃষিত মাটিগুলো চুষে চুষে খেয়ে ফেলেছে। এমন সময় তাদের ভাবনার পর্দা ছেদ করে ডান দিকের পাহাড় থেকে এক ঝাঁক গুলি এসে তাদেরকে আলিঙ্গন করলো। সাথে সাথে কয়েকজন রুশ সেনা গোড়া কাটা গাছের মতো পাষাণ পাহাড়ের কুলে লুটিয়ে পড়লো।

একটু পূর্বেও যে রুশ সেনারা চরম উদ্ধতভাব নিয়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সামনে অগ্রসর হচ্ছিল, তারাই এখন চোরাগুপ্তা আক্রমন সামাল দিতে না পেরে চরম অসহায়ত্ব বোধ করছে। ন'বছরের এক মুসলিম কিশোরী বারবার পাহাড় বদলিয়ে একটি মাত্র অস্ত্র দ্বারা যে তাদের অসংখ্য সৈন্যকে জনমের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে তা তারা বুঝতেও পারেনি। তারা মনে করছে, শত শত মুজাহিদ পাহাড়ের চূড়া থেকে মর্টার তাক করে বসে

আছে। সুতরাং পালাবারও কোন পথ নেই। বেঁচে থাকতে চাইলে শুধু একটি পথই খোলা আছে। তা হল, ট্যাংকের গোলা দ্বারা পাহাড়গুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সামনে ময়দান তৈরী করা। কিন্তু বার বার প্রচন্ড আঘাত হেনে এতেও তারা ব্যর্থ হল। এদিকে লাশের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলছে।

নিজ সেনাদের লাশের বহর দেখে ভীত সন্ত্রস্ত কমান্ডার একটু সাহস সঞ্চয় করে নির্দেশ দিল, সামনে বাড়ো। নির্দেশ মতো সামনে এগুতেই ওদিকের পাহাড় থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে অগ্রগামী বাহিনীর বুকগুলো ঝাঁঝরা করে দিল। কমান্ডার এবার মৃত্যু অনিবার্য ভেবে সৈন্যদেরকে সামনে বাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চিৎকার দিয়ে বললো, সামনে বাড়ো। এমতাবস্থায় গর্জে উঠলো আরেকটি পাহাড়। লুটিয়ে পড়লো আরো কয়েকজন রুশ সেনা।

মুসলমানদের রক্ত নিয়ে যারা তামাশায় মেতে উঠে, মুসলমানদের রক্ত যাদের কাছে পানির মূল্যও রাখে না, আজ প্রকৃতি তাদের উপহাস করে হাসছে আর বলছে, প্রতিশোধ! এরই নাম যথার্থ প্রতিশোধ!!

এখনও ওরা নির্ণয় করতে পারেনি যে, বুলেটগুলো ঠিক কোন দিক থেকে আসছে এবং আক্রমণকারীরা সম্ভাব্য কতজন হতে পারে। প্রচন্ড আক্রমণের ভয়াবহতা তাদেরকে এসব ভাবারই অবকাশ দিচ্ছে না।

তবুও ব্যর্থতা ঢাকার ব্যর্থ কসরত। ট্যাংকগুলোর উদ্দেশ্যহীন অগ্নিবর্ষণ ও উপর্যুপরি আঘাতে নিরব নিস্তব্ধ পাহাড়গুলো বার বার কেঁপে উঠছে। মনে হচ্ছে, প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে তারা অবিরাম গোলা বর্ষণ করবে, তবুও ব্যর্থতা ঢাকতে হবে। যেখানে ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা, গোলাবর্ষণ কর। সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাক, একটি প্রাণীও বেঁচে না থাকুক তাতে এতটুকু দুঃখ বোধ জাগবে না। কেননা এদেশে তারা মানবতার ডাকে আসেনি। তারা এসেছে এশিয়ার এই হৃদপিন্ডটাকে দখল করতে। কি ধ্বংস হল, কি রইল, কে মরল, কে বাঁচল তাদের সেদিকে তাকাবার কোন প্রয়োজন নেই। সোজা কথায়, তারা আফগানিস্তানের মাটি চায়, মানুষ চায় না।

কমান্ডার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা শৃংখলা ফিরিয়ে এনে সামনে এগুতে চাইলেও সাহসের অভাবে ব্যর্থ হল। এভাবে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য সেনাকে পাহাড়ের কোলে চিরকালের মতো ঘুমিয়ে পড়তে হলো।

এবার কমান্ডার জীবিত সেনাদেরকে হালকা অস্ত্র নিয়ে পাহাড়ে উঠার আদেশ করলো। আর ট্যাংক বাহিনীকে যে কোন হামলা প্রতিহত করার জন্য হুশিয়ার থাকার পরামর্শ দিল।

গেরিলা সেনারা উপরে উঠে আক্রমণকারীদেরকে তালাশ করতে লাগলো। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোথাও কোন মানুষের গন্ধও নেই। এক সেনা গালি দিয়ে বলল, বদমায়েশরা গেল কোথায়? সবাই কি হাওয়ার সাথে মিলিয়ে গেল? এতক্ষণে তো কমপক্ষে দু'চারটি লাশ পড়ার কথা।

প্রতিপক্ষের গোলা থেমে গেছে। অনেকক্ষণ যাবত কোন বুলেট ফেরাউনী বুকগুলোকে ঝাঁঝরা করছে না। তাই চরম প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাগ্রতা নিয়ে তারা আক্রমনকারীদেরকে খুঁজতে পাহাড়গুলো তন্ন তন্ন করে চষে বেড়াচ্ছে। ওদেরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

হঠাৎ ছোট ছোট কয়েকটি পদচিহ্ন দেখে তারা থমকে দাঁড়ালো। সামনে রক্তের লাল লাল ছাপ। ওই যে একটি লাশ। ক্রোধে ফেটে পড়লো ওরা। বেয়নেট বের করে প্রাণহীন ঘাতকের বুকের মাঝখানে বসিয়ে দিবার ইচ্ছা করলো। কিন্তু এ কি? এ যে এক কিশোরী মানবশূণ্য এই জনপদটায় কেন এসেছিল কুসুমের মতো এই মেয়েটি? অজ্ঞাতসারেই মেয়েটির জন্য একটু সহানুভূতি জেগে উঠলো তাদের।

কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, ন'বছরের একটি মেয়ে আর তার হাতে একট ক্লাসিনকভ। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত তার। বুকে বুলেটের আঘাত।

আশে পাশে কোথাও কোন মুজাহিদের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবে কি আমরা এতক্ষণ একজন কিশোরীর সাথে মুকাবিলা করছি? ছিঃ এত লজ্জা লুকাবো কোথায়!

অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত বিশাল ট্যাংক বাহিনীকে দীর্ঘ চার ঘন্টা ঠেকিয়ে রেখেছিল এই ছোট্ট কিশোরী। আর নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে লাল সেনাদের এক বিরাট অংশকে। মেয়েটি আফগানী বলেই হয়তো এমন দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে।

ঘটনা এখানেই শেষ। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এই ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা অসীম কুদরত ওয়ালা। তিনি ইচ্ছে করলে সামান্য কোন প্রাণী দ্বারাও ইসলামের বিরাট খেদমত নিতে পারেন, চিরতরে খতম করে দিতে পারেন, কুফুরীর কালিমায় লেপা শত শত ইসলামের শত্রুকে। সুতরাং একথা ভেবে কখনোই ইসলামের খেদমত থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে না যে, আমি তো দুর্বল, আমার তো ধনবল জনবল কিছুই নেই। কেননা, আল্লাহ তায়ালা যাকে যে পরিমাণ ক্ষমতা দিয়েছেন, সে সেই পরিমান ইসলামের খেদমত করল কি-না সেটাই তিনি দেখবেন এবং সেই অনুপাতেই হিসাব নিবেন। অতএব, কারো যদি জান, মাল, সঠিক পরামর্শ এবং লিখনীর মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করার সামর্থ থাকে তাহলে তাকে সবগুলো দিয়েই ইসলামের খেদমত করে যেতে হবে। অন্যথায় হাশরের ময়দানে অবশ্যই তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

এমনিভাবে যদি কারো দৈহিক শক্তি, আর্থিক শক্তি, লিখনী শক্তি ইত্যাদির কোনটাই না থাকে, শুধু পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা থাকে তাহলে তাকে পরামর্শ দিয়েই ইসলামের খেদমত করতে হবে। মোট কথা, প্রত্যেককে ইসলামের প্রচার প্রসার ও উন্নতির জন্য আপন তৌফিক অনুসারে কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হোন। আমিন। ❐

তোমরা কুফুরী চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য সামরিক সরঞ্জাম ও শক্তি অর্জন করে প্রস্তুত থাক।

-সুরা আনফাল ঃ ৬০

আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবীর করুণ পরিণতি

আল্লাহর এক ওলী। আশেকে রাসূল। হৃদয়ের সমস্ত অংশ রাসূলের প্রেম-ভালবাসায় পরিপূর্ণ। প্রতি বছর হজ্বে যাওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ করা তার নিয়মিত অভ্যাস।

রাসূল প্রেমে আত্মহারা এই আশেকে রাসূলের নাম ইবনে যাগার ইয়ামানী (রাহ.)। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তিনি হজ্বের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওযায়ে আতহারে উপস্থিত হলেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার প্রিয় সাথীদ্বয় হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) এর শানে শুরু করলেন স্বরচিত কবিতাবৃত্তি।

গভীর ভালবাসা আর মমতাপূর্ণ কবিতা পাঠ শেষে আবেগে আপ্লুত এই নবী প্রেমিক যখন ফিরে আসতে উদ্যোগী হলেন তখন জনৈক রাফেজী সামনে এসে দাঁড়ালো এবং তার বাড়ীতে দাওয়াত গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালো। ইবনে যাগার (রাহ.) ভদ্রতার খাতিরে এবং সুন্নাতে রাসূলের প্রতি লক্ষ্য করে তার দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এই দাওয়াতদানকারী লোকটি হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর প্রতি কিরূপ বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের শানে কবিতা আবৃত্তি করার কারণে সে তার জন্য কত ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করে রেখেছে।

ইবনে যাগার (রাহ.) দাওয়াতী মেহমান। তিনি ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিছানায় বসে খানার এন্তেজার করছেন। কিন্তু বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলেও খানা আসার কোন নাম গন্ধ নেই। এমন সময় হঠাৎ তিনি দেখলেন যে, দু'জন হাবশী ঘরে প্রবেশ করলো এবং দাওয়াতদানকারী লোকটির ইংগিত পাওয়া মাত্র ঝাপটে ধরে তার মোবারক জিহ্বা ধারালো ছুরি দিয়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেললো। সাথে সাথে পাপিষ্ট রাফেযী তাকে লক্ষ্য করে বললো, যাও, এই কর্তিত জিহ্বা নিয়ে

আবু বকর ও উমরের কাছে যাও, যাদের প্রশংসায় তুমি পঞ্চমুখ। ক্ষমতা থাকলে তারা তা জোড়া লাগিয়ে দিক।

হযরত ইবনে যাগার (রাহ.) দেরী না করে কর্তিত জিহ্বা হাতে নিয়ে রওজা শরীফে ছুটে গেলেন এবং প্রিয় নবীজির চেহারা বরাবর দাঁড়িয়ে কান্না বিগলিত কণ্ঠে পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। অতঃপর রাতের বেলায় ঘুমানোর পর স্বপ্নযোগে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করলেন। তার সাথে রয়েছেন এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)।

তিনি দেখলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত থেকে কর্তিত জিহ্বা স্বীয় হস্তে ধারণ করে যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ার পর তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার জিহ্বা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে গেছে। দরবারে নবুওয়াতের এই আশ্চর্য মোযেযা সংঘঠিত হওয়ার পর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন।

পরবর্তী বছরও ইবনে যাগার (রাহ.) যথানিয়মে হজ্ব আদায় করে মদিনা শরীফে পবিত্র রওযায় হাজির হলেন। যখন তিনি সেই আবেগমিশ্রিত কবিতা আবৃত্তি সমাপ্ত করে পিছনের দিকে মুখ ফিরালেন তখন তিনি দেখলেন যে, এবারও এক যুবক তার সামনে এসে উপস্থিত হল এবং তার বাড়ীতে দাওয়াত কবুলের জন্য বিনীত আরজ করলো।

ইবনে যাগার (রাহ.) আল্লাহর উপর ভরসা করে যুবকের দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং সাথে সাথে তার বাড়ীতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করা মাত্র তাঁর বুঝতে মোটেও অসুবিধা হলো না যে, এটি সেই বাড়ী যেখানে গত বছর অত্যন্ত নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে তার জিহ্বা কর্তন করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি মোটেও বিচলিত হলেন না। আল্লাহর উপর ভরসা করে ঘরে প্রবেশ করলেন।

যুবক এবার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আদরের সাথে তাকে বসানোর ব্যবস্থা করলো এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার দ্বারা অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে আপ্যায়ন করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর যুবকটি ইবনে যাগার (রাহ.) কে একটি কামরায় নিয়ে গেল। তিনি সেখানে একটি বানর দেখতে পেলেন। যুবক তাকে লক্ষ্য করে বললো, হুজুর! আপনি কি এ বানরটিকে চিনতে পেরেছেন? তিনি না সূচক জবাব দিলে যুবক অশ্রুপূর্ণ নয়নে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হযরত! এই বানর সেই ব্যক্তি যিনি গত বছর আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) এর শানে প্রশংসামুলক কবিতা আবৃত্তি করার কারণে আপনার পবিত্র জিহ্বা কেটে দিয়েছিল। আশেকে রাসূলের সাথে দুঃখজনক এই আচরণের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাকে নিকৃষ্ট বানরে পরিণত করে দিয়েছেন। হুজুর! আমি এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত যে, তিনি আমার জন্মদাতা পিতা এবং আমি তার সন্তান।

আলোচ্য ঘটনায় কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। (এক) এ ঘটনা দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায় রওজায়ে আকদাসে অবস্থান করছেন। (দুই) তার মুযিযা প্রকাশের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। (তিন) যারা আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবী করে এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে কষ্ট দেয় তাদেরকে দুনিয়াতেই করুণ পরিণতি ভোগ করতে হয়। লাঞ্চনা বঞ্চনা আর অপমানের জিন্দেগী নসীব হয়। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যারা আল্লাহর ওলীদের সাথে বেয়াদবী করে তারা যেন আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তার খাস বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখার এবং তাদের ফয়েজ ও বারাকাত হাসিল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ❐

(বিঃ দ্রঃ এ ঘটনাটি নবম হিজরী শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ আল্লামা আব্দুল আজীজ মাক্কী (রাহ.) 'ফয়জুল জুদ আলা হাদীসে শায়বানী' নামক কিতাবে 'নশরুল মুহাসিন' গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন)

কত বড় রায্যাক তিনি!

হযরত সুলাইমান (আঃ)। আল্লাহর নবী। তাঁকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছিলেন অসাধারণ ক্ষমতা। তিনি জীব-জন্তু, পশুপাখি তথা সকল মাখলুকের ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন। তারা সকলেই তার কথা শুনত। তার কথামত চলত।

তিনি যখন দেখলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অসামান্য ক্ষমতা দিয়েছেন এবং সমস্ত মাখলুক তার কথায় উঠা-বসা করে তখন একদিন তিনি সুযোগ বুঝে আল্লাহর নিকট আরজ করে বললেন, হে খোদা! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি সমস্ত সৃষ্টি জীবকে পূর্ণ এক বৎসর খানা খাওয়াতে চাই।

জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে সুলাইমান! তুমি কিছুতেই তা পারবে না। তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) বললেন, তাহলে এক সপ্তাহের অনুমতি দিন।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, তাও তুমি পারবে না। সুলাইমান (আঃ) বললেন, তাহলে কমপক্ষে একদিনের অনুমতি দিন।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, সুলাইমান! তুমি একদিনও আমার সমস্ত মাখলুককে খাওয়াতে সক্ষম হবে না। তখন হযরত সুলাইমান (আঃ) আবারও বললেন যে, মাত্র একদিনের সুযোগ দিয়ে দেখুন আমি পারি কিনা। এভাবে তিনি বারবার একদিনের অনুমতি চাইতে থাকলে আল্লাহ তায়ালা তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে হযরত সুলাইমান (আঃ) মহাখুশি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি সকল জ্বিন ও মানুষকে একত্রিত করলেন এবং নির্দেশ দিয়ে বললেন, যাও, সমগ্র পৃথিবীতে যত গরু, ছাগল আছে সবগুলোকে নিয়ে এসো। এবং ঐ সকল প্রাণীও নিয়ে এসো যেগুলো খাওয়া হয়।

হযরত সুলাইমান (আঃ) এর নির্দেশ মোতাবেক তারা সবকিছু একত্রিত করলো এবং বিশাল বিশাল ডেগ ডেকচিরও ব্যবস্থা করলো।

অতঃপর সবগুলো প্রাণী জবাই করে খানা পাকানো হল।

হযরত সুলাইমান (আঃ) বাতাসকে বললেন, তুমি সমস্ত খাবারের উপর বাতাস দিতে থাক যেন তা নষ্ট না হয়ে যায়।

খানা পাকানো শেষ হলে জমিনের উপর এতবড় একটি দস্তরখানা বিছানো হলো যা এক মাসের পথ পরিমাণ লম্বা এবং এক মাসের পথ পরিমাণ প্রস্থ।

এবার আল্লাহ পাক হযরত সুলাইমান (আঃ) কে বললেন, হে সুলাইমান! আমার মাখলুকাতের মধ্যে সর্বপ্রথম কাকে দিয়ে তুমি খানা খাওয়ানো শুরু করবে? জবাবে সুলাইমান (আঃ) বললেন, আমি সামুদ্রিক জীব দিয়ে খানা খাওয়ানো উদ্বোধন করতে চাই। তখন আল্লাহ তায়ালা সমুদ্রের একটি মাছকে হযরত সুলাইমান (আঃ) এর মেহমানদারী গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পেয়ে ঐ মাছটি তার মাথা উত্তোলন করলো এবং হযরত সুলাইমান (আঃ) কে সম্বোধন করে বললো,

ঃ আমি শুনতে পেরেছি যে, আপনি নাকি মেহমানদারীর বিশাল আয়োজন করেছেন। আর আমিই নাকি প্রথম মেহমান?

সুলাইমান (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, আস এবং তোমার মেহমানদারী গ্রহণ কর। তোমার জন্য সব কিছু প্রস্তুত। সম্মতি পেয়ে মাছটি সমুদ্র থেকে উপরে উঠে এলো এবং দস্তরখানের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যত খাবার ছিল তা মুহূর্তের মধ্যে এক লোকমায় খেয়ে ফেললো। অতঃপর সে সুলাইমান (আঃ) কে ডেকে বললো, হে সুলাইমান! আমাকে তৃপ্তি সহকারে খানা খাওয়াও।

মাছের কান্ড দেখে হযরত সুলাইমান (আঃ) সীমাহীন আশ্চর্য হলেন। এখন মাছের কথা শুনে আরও বেশী আশ্চার্যান্বিত হলেন। তাই তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, পৃথিবীর সকল প্রাণীর জন্য রান্না করা খাবার তুমি এক লোকমায় খেয়ে ফেললে; তারপরও তুমি পরিতৃপ্তি না হওয়ার অভিযোগ করছো?

মাছটি বললো মেহমানের প্রতি মেজবানের জবাব কি এমনই হয়? আমি আপনার দাওয়াতী মেহমান। আমি তো দাওয়াত ছাড়া খেতে আসিনি। এখন পেট পূর্ণ করে তৃপ্তি সহকারে খানা

খাওয়ানো কি আপনার উচিত নয়? হে আল্লাহর নবী! ভাল করে শুনে রাখুন, আমি আপনার দাওয়াতে এসে যে এক লোকমা খানা খেলাম প্রতিদিন আল্লাহ পাক আমাকে এরূপ তিন লোকমা খানা খাওয়ায়ে থাকেন। আপনিই হলেন সেই ব্যক্তি যার মেহমানদারী কবুল করে আমাকে আজ দু'লোকমা পরিমাণ খাবার না খেয়ে অভুক্ত থাকতে হবে। নিশ্চয়ই আপনি আমার অধিকার খর্ব করেছেন।

তার এ বক্তব্য শুনে হযরত সুলাইমান (আঃ) বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না। সাথে সাথে শুধু সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এতটুকু বললেন, হে পাক পরওয়ারদিগার! সৃষ্টি জগতের লালন-পালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা তোমার পক্ষেই সম্ভব। এ কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। তুমি তাদেরকে এমন স্থান থেকে রিজিক পৌঁছাও যা তারা জানেও না।

মুহতারাম, পাঠক বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তায়ালা কত বড় রায্যাক! কত বড় রিযিক দাতা!! যদি একটি মাছকে তিনি এত পরিমাণ খানা খাওয়ায়ে থাকেন তাহলে পৃথিবীর সমস্ত মাখলুকাতকে তিনি কি পরিমাণ খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন! সুবহানাল্লাহ!

একজন মানুষের চেয়ে একটি হাতি কত বড়! এরা সাধারণত কলা গাছ খায়। কোন দিন শুনেছেন কি তারা কলাগাছের চাষ করেছে? এদের খাবারের ব্যবস্থা কে করেন? আল্লাহ তায়ালাই করেন।

আসল কথা হলো মানুষ ছাড়া সকল সৃষ্টি জীবই মনে করে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই তাদের রিযিকদাতা। তাদের রিজিকের জিম্মাদারী তারই হাতে। তাই আল্লাহ পাক তাদের ধারণা মোতাবেক তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করে থাকেন। তাদের স্বাস্থ্যও আমাদের চেয়ে অনেক ভালো। সুতরাং আমরাও যদি এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ পাকই আমার রিযিকের জিম্মাদার। তিনিই আমার রিযিকের সমস্যার সমাধান করবেন। আমি তো কেবল উসীলা মাত্র। তিনি

ইচ্ছা করলে উসীলা ছাড়াও সবাইকে লালন পালন করতে পারবেন; তাহলে নিশ্চয়ই ধারণা অনুযায়ী তিনি আমাদের সাথে মোয়ামালা করবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা হাদীছে কুদসীতে বলেন, আমি বান্দার সাথে ঐরূপ ব্যবহার করে থাকি যেরূপ সে আমার প্রতি ধারণা রাখে। আল্লাহ পাক এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের আকীদাকে দুরস্ত করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥ ❐ (সূত্রঃ নাফহাতুল আরব পৃঃ১১০)

তোমরা কি ঐসব লোক যারা .....

১৯৮৮ সাল। ক'দিন পূর্বে আমাদের এস, এস, সি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আগেই নিয়ত ছিল, ফাইনাল পরীক্ষার পরে দেরী না করে চিল্লার জন্য জামাতে বের হবো। এজন্য বেশ কয়েকবার নামও লিখিয়েছি। অবশ্য এর পূর্বেও আল্লাহর রাস্তায় ৪০ দিন সময় লাগানোর সুযোগ হয়েছিল আমার। তখন থেকেই এ কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অন্তরে গেঁথে বসে। আমি বুঝতে পারি যে, এ কাজ উম্মতে মোহাম্মদীর একটি পবিত্র দায়িত্ব। এ কাজের কারণেই আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যা পেয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের মাধ্যমে নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। আর কোন নবী দুনিয়াতে আসবেন না। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতিকে সঠিক পথ দেখানো, তাদেরকে আল্লাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। যদি আমরা এ দাওয়াতের মেহনত না করি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

যা হোক, পূর্বের নিয়ত অনুযায়ী আমি ক'জন সাথীসহ জামাতে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের জিম্মাদার ছিলেন ব্রাহ্মনবাড়ীয়া সরকারী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপ্যাল জনাব মোঃ আতাউর রহমান সাহেব। তিনি জামাতের সবাইকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। বিশেষ করে আমাকে তিনি নিজের ছেলের মতোই আদর-স্নেহ করতেন। গত কয়েক বছর পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আল্লাহ তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করুন। আমীন।

কাকরাইল থেকে আমাদেরকে নেত্রকোনা জেলার ধোবাউড়া থানায় পাঠানো হয়। সেখানে দীর্ঘ এক মাস কাজ করার পর হালুয়াঘাট হয়ে আমরা ঢাকায় ফিরি। যখন আমরা হালুয়াঘাট মার্কায মসজিদে অবস্থান করছিলাম তখন সেখানকার মার্কাযের আমীর সাহেব আমাদের নিকট তার বাস্তব জীবনের একটি করুণ কাহিনী বর্ণনা করেন। মনে হয়, মৃত্যু পর্যন্ত আমি তা ভুলতে পারবো না। তিনি বলেন-

আজ থেকে ১২ বছর পূর্বে আমাদের জামাত কক্সবাজার গিয়েছিল। আমরা সেখানকার একটি গ্রামের মসজিদে অবস্থান নেই। আমাদের আগমনের সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে গ্রামের নেতৃস্থানীয় সর্দার-মাতবররা জরুরী মিটিং আহবান করে গ্রামের সকল লোকদেরকে একত্রে জড়ো করে। বিভিন্ন প্রকার আলোচনা পর্যালোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১। জামাতের লোকদের সাথে কোন কথাবার্তা বলা যাবে না।

২। তাদের সাথে সালাম মোসাফাহা করা যাবে না।

৩। বাজারের কোন ব্যবসায়ী তাদের নিকট কোন মালামাল যেমন চাউল, ডাউল, মাছ, তরকারী, লবন, ডিম ইত্যাদি বিক্রি করতে পারবে না।

৪। আজ রাতেই তাদের সকল বিছানা-পত্র পানিতে ফেলে দিতে হবে।

চতুর্থ সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য তারা কয়েকজন যুবক নিযুক্ত করল। যুবকরা রাতে এসে সত্যি সত্যিই মসজিদে ঢুকে তাদের সকল বেডিং পত্র পুকুরে ফেলে দিল। একটি বারের জন্যও তারা ভাবল না যে, এ কনকনে শীতের রাতে লোকগুলো কিভাবে ঘুমাবে। কিভাবে তাদের রাতটি অতিবাহিত হবে। উপরন্তু উদ্দেশ্য সফল করতে পেরে তারা হর্ষ উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। তাদের কঠিন হৃদয় তখন হয়তো বলছিল, তাবলীগিদেরকে আজ জনমের শিক্ষাটাই দিয়ে দিলাম।

তাবলীগের প্রতি চরম বিদ্বেষের কারণে সামান্য মানবতা বোধটুকু পর্যন্ত তাদের অবশিষ্ট ছিল না।

জামাতের সকলেই ছিলেন মজবুত সাথী। আমীর সাহেব ছিলেন আরও মজবুত। তাঁর ঈমানের মজবুতী ও আমলী জিন্দেগী সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে।

তিনি সকলকে বসিয়ে বললেন, ভাইগণ! আপনারা ধৈর্য ধারণ করুন। সবর করুন। আজকে এলাকার লোকজন আমাদের ছামানা পুকুরে ফেলে দিয়েছে এতে মনক্ষুন্ন হওয়ার কিছুই নেই। আমাদের পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণ দ্বীনের খাতিরে এর চেয়ে অনেক বেশী কুরবানী দিয়েছেন, কষ্ট স্বীকার করেছেন। যদি আমাদের উপর আরও বড় কোন বিপদ আসে তবুও আমাদেরকে দ্বীনের জন্য তা মেনে নিতে হবে। আমরা আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ করেই যাব, ইনশাআল্লাহ। এতে কি আপনারা একমত?

সাথীরা একবাক্যে বলে উঠল, হ্যাঁ আমরা একমত। দ্বীনের জন্য আমরা বুকের শেষ রক্ত বিন্দুটুকু পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজী আছি। আমরা কিছুতেই পিছপা হবো না, ইনশাআল্লাহ।

প্রচন্ড শীতে সাথীরা সারারাত বসিয়ে কাটিয়ে দিল। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে আমীর সাহেব সকলকে নিয়ে কেঁদে-কেটে দোয়া করলেন। পরদিন সকালে তিনজন খেদমতের সাথী বাজারে গেলেন। পথে সকলকেই তারা সালাম দিলেন। মোসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। কিন্তু বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ছোট বালকটি পর্যন্ত কেউই তাদের সালামের জবাব দিল না। মোসাফাহাও করল না। এমন কি তাদের সাথে একটি কথাও বললো না। সবাই মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। তাদের এ আচরণে খেদমতের সাথীরা সীমাহীন বিস্মিত হলো। ভাবল, ব্যাপার কি? আমরা এমন কি অপরাধ করেছি, যার কারণে আমাদের সাথে তারা এমন আচরণ শুরু করল? আমরা মানুষকে সত্যের কথা বলি, কালেমার দাওয়াত দেই, নামাযের জন্য আহবান করি, আখেরাত মুখী করার চেষ্টা করি-এটাই কি আমাদের অপরাধ?

যা হোক, এ সকল কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় তারা বাজারে পৌঁছল। সেখানে ব্যবসায়ীদের নিমর্ম আচরণে তারা আরও আশ্চর্য হলো। তারা দেখল, কেউই তাদের নিকট কিছু বিক্রি করছে না। কিছু কিনতে চাইলে তাদের আপাদমস্তক একবার তাকিয়ে শুধু এতটুকু বলে যে, আপনারা কি জামাতের লোক? 'হ্যাঁ' বলতেই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যেত। আর একটি কথাও তারা বলতো না। মনে হতো, তারা যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু এক দোকানদার আস্তে করে বললো, আপনাদের সাথে কথাবার্তা বলতে, সালাম-মোসাফাহা করতে এবং কোন কিছু বিক্রয় করতে আমাদেরকে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে। এবার সবকিছু বুঝতে পেরে খালি হাতে মসজিদে ফিরে তারা আমির সাহেবসহ সকল সাথীর নিকট ঘটনা বর্ণনা করল।

সবকিছু শুনে আমীর সাহেব বললেন, প্রয়োজনে আমরা না খেয়ে উপোস থাকবো। গাছের পাতা ভিজিয়ে রস খাব তবুও আমরা আমাদের নিদ্দিষ্ট ১০দিন সময় এ এলাকায় কাটিয়ে যাব। আপনারা কি বলেন? তখন সকলেই সমস্বরে বললো, জ্বী হুজুর, আমরা এতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। আমীর সাহেব আলহামদু-লিল্লাহ বলে সকলকেই আমলে জুড়ার অনুরোধ করলেন।

পরামর্শ অনুযায়ী একের পর এক আমল চলতে লাগলো। এলাকার লোকজন মসজিদে নামায পড়তে আসে ঠিকই কিন্তু তাদের সাথে কোন কথা বলে না। একে অপরের সাথে বিদ্রুপের হাসি হেসে চলে যায়। এভাবে ২/৩ দিন চলে গেল। জামাতের সাথীদের কাছে খাওয়ার যা কিছু ছিল তা ফুরিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পানি ছাড়া মুখে দেওয়ার মতো কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

এভাবে ক্রমাগত কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে থাকতে ক্ষুধার যন্ত্রণায় তারা অতীষ্ট হয়ে পড়লো। সকলেই শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলো, চক্ষু বসে গেল।

দিনের বেলায় তারা এলাকায় ঘোরাফেরা করে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করে। রাতের বেলায় খোদার দরবারে সকলে মিলে কায়মনোবাক্যে দোয়া করে।

মুরুব্বী বলেন, আমরা কোনদিন এলাকাবাসীর জন্য বদদোয়া করিনি। বরং তাদের হিদায়েতের জন্যই বারবার দোয়া করেছি। আমাদের আমীর সাহেব দোয়ার জন্য হাত উঠিয়েই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেন, হে খোদা! মানুষের অন্তরতো তোমারই হাতে। তুমি তাদের অন্তরগুলোকে সত্যের পথে ঘুরিয়ে দাও। হক্ব বুঝার তৌফিক দাও। তাদের সবাইকে তুমি হেদায়েত নসীব করো। তারা বুঝে না বলেই আমাদের সাথে এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করছে। যদি বুঝতো তবে কখনোই তারা এমন করতো না। তুমি তাদেরকে সঠিক বুঝ দান কর।

আমীর সাহেবের সাথে সাথে আমরা সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়তাম। অন্তর থেকেই তাদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এ এলাকায় দ্বীনি জামাতের লোকদের পদচারণা ও দোয়ার ফলে আল্লাহপাক সেখানে কোন না কোন দিন হয়তো হেদায়েতের হাওয়া চালু করবেন। যদি বর্তমানের লোকজন হেদায়েত নাও পায় কিংবা তাবলীগের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের ধারণার পরিবর্তন নাও ঘটে তবুও হতে পারে এ উসীলায় তাদের পরবর্তী বংশধররা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে এবং তাবলীগ সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিষ্কার হবে।

এভাবে দোয়া রোনাজারী ও কান্নাকাটির পর আমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। আমরা দূর্বল দেহ নিয়ে কোন রকম ঢাকায় এসে সেখানকার কারগুজারী শুনালাম। এসব কথাবার্তা শ্রবণ করে অনেকের চোখেই পানি এসে গেল। কারো কারো দু'চার ফোটা পানি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই গন্ড বেয়ে নীচে গড়িয়ে পড়লো।

মুরুব্বীগণ আমাদেরকে বললেন, আপনারা বড়ই ভাগ্যবান। কারণ গাছের পতার রস খেয়ে আপনারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নত পালন করলেন। আমাদের বিশ্বাস, যেসব এলাকায় আপনাদের কদম পড়েছে সেখানে একদিন না একদিন সত্যের আলো জ্বলবেই, সেখানকার লোকগুলো একসময় হয়তো দাওয়াতের কাজকে এমনভাবে আঞ্জাম দিবে যা সকলকেই অবাক করে দিবে।

মুরুব্বীদের ধারণাই বাস্তবে পরিণত হলো। আমি এ ঘটনার

প্রায় ১০ বছর পর একটি জামাত নিয়ে কক্সবাজারের সেই এলাকায় যাই যেখানে পূর্বে গিয়েছিলাম। কিন্তু এবারের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কল্পনাতীত।

আমরা পৌঁছার সাথে সাথে গ্রামের অসংখ্য লোক মসজিদে এসে জড়ো হলো। নেতৃস্থানীয় লোকজন বিনয়ের সাথে আমাকে বললো, হুজুর! মেহেরবানী করে আমাদের এলাকায় যতদিন থাকবেন ততদিন আপনারা রান্না-বান্নার সামান-পত্রে হাত দিবেন না। আপনাদের খানা পিনার ব্যবস্থা আমরাই করবো। যদি আমাদেরকে আপনাদের খেদমত করার সুযোগ না দেন তাহলে আমরা খুবই কষ্ট পাব। আপনারা আমাদের মেহমান। আপনাদের সম্মান করা ও যাবতীয় জরুরত পুরা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি আমরা আপনাদের খেদমত না করি তাহলে হাশরের ময়দানে আমরা কি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে মুখ দেখাব? তিনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, হে অমুক! তোমাদের এলাকায় আমার রক্তমাখা দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে একটি জামাত গিয়েছিল, কিন্তু তোমরা তাদের ইজ্জত করনি। সহযোগীতা করনি, তাহলে আমরা কি জবাব দিব? হুজুর! দয়া করে আপনাদের যা কিছুর প্রয়োজন হবে আমাদের কাছে বললে আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা করে দিব। অনুগ্রহপূর্বক আপনাদের খেদমত থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।

তাদের কথাগুলো আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। ভাবলাম, এটি কোন স্বপ্নপুরী নয় তো? অতঃপর হঠাৎ বলে উঠলাম, তোমরা কি ঐসব লোক যারা প্রচন্ড শীতের সময় সকল প্রকার মানবতা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিছানাগুলো পানিতে ফেলে দিয়েছিলে? তোমরা কি ঐসব লোক যারা আমাদের সাথে সালাম-কালাম কথা-বার্তা বন্ধ করে দিয়েছিলে? তোমরা কি তারাই, যারা শুধুমাত্র দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আসার অপরাধে (?) আমাদের নিকট সকল প্রকার বেচা-কেনা বন্ধ করে দিয়েছিলে?

আমার এ কথা শুনে সকলেই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। তাদের কান্না দেখে আমাদের চোখেও পানি এসে গেল। এতে সেখানে এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হল।

কিছুক্ষণ পর তাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ লোকটি বললো হুজুর! আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা না বুঝে আপনাদের সাথে এমন নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ করেছিলাম। আমরা আপনাদেরকে যে কষ্ট দিয়েছিলাম সে কথা স্মরণ হলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি।

হুজুর! আসলে আমাদেরকে বুঝানো হয়েছিল যে, তাবলীগ একটি ভ্রান্ত দল। এরা নতুন ইসলাম প্রচার করতে চায়। চায় সরল সহজ মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করতে।

আমরা বাছ-বিচার না করে অন্ধভাবে এ সকল স্বার্থান্বেষী লোকদের কথা বিশ্বাস করেছিলাম। ফলে আমাদের দ্বারা এরূপ জঘন্য ও দুঃখজনক আচরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে যখন ধীরে ধীরে আমরা তাবলীগের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম, তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে ভাল করে খুঁজ-খবর নিলাম, তাদের সাথে কিছুদিন সময় কাটালাম, তখন আমাদের নিকট একথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তাবলীগ জামাত নিশ্চয়ই কোন ভ্রান্ত দল নয়। বরং এরা তো ঐ মহান দায়িত্ব পালন করছেন, যে দায়িত্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্বের ভাষনে আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তারা তো ঐ কাজ করছেন, যে কাজ আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। যে কাজের জন্য তিনি তার মাহবুব বান্দা নবীদের পর্যন্ত মার খাইয়েছেন। যে কাজ আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল করেছেন।

এতটুকু বলে লোকটি আবারও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। অতঃপর পুনরায় বললো, হুজুর! আমরা আপনাদের উপর সীমাহীন জুলুম করেছি। দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।

বৃদ্ধ লোকটি কথা শেষ করার পর আমি বললাম, আপনাদের কোন দোষ নেই। আপনারা সরল সহজ মানুষ। আপনাদেরকে অন্যভাবে বুঝানো হয়েছে বলেই আপনারা এমন করেছেন। সুতরাং আমরা আপনাদের ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ ও আপনাদের ক্ষমা করে দিন। তখন সকলেই এক সাথে বলে উঠলো, আমীন।

প্রকৃত পক্ষে, তাবলীগ যে একটি হক্ব কাজ তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এর একটি বড় প্রমাণ হলো টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা। কারণ মাত্র আটত্রিশ বছরের ব্যবধানে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটাতে পারা কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন দল বা মতবাদই এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। পারেনি এত অধিক সংখ্যক লোককে একত্রিত করতে। উপরন্তু আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষনা করেছেন, 'তোমরাই সর্বশ্রেষ্ট জাতি, মানুষের মঙ্গলের জন্যই তোমাদেরকে বের করা হয়েছে। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনবে।' (সুরায়ে আল-ইমরান, আয়াতঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করাকে এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং যে কাজের জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে আখ্যা পেলাম, যদি আমরা সেই কাজ না করি তাহলে কি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব বাকী থাকবে? কখনোই নয়। আল্লাহ আমাদের সকলকে বুঝার তৌফীক দান করুন এবং অতি তাড়াতাড়ি এ কাজে অংশ গ্রহণ করার তাওফীক নসীব করুন। আমীন। ❐

মুজাহিদের তামান্না

হযরত আনাছ বিন মালেক (রা.) এর ছেলে হযরত ইবনে আসাকের আবু বকর (রা.) জিহাদের সফর থেকে বাড়ীতে ফিরে এলেন। জিহাদের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে পুত্রকে সম্বোধন করে পিতা বললেন, বাবা! তুমি কি জিহাদের ময়দানে এমন কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছ, যা বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক? উত্তরে পুত্র বললেন, হ্যাঁ, আমি জিহাদের ময়দানে একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখেছি। তা আমি আপনাকে এক্ষুনি শুনাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি বলতে লাগলেন, একদিন আমরা

যুদ্ধ শেষে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ আমাদের এক সাথী চিৎকার করে বলে উঠল, হায়, আমার পরিবার! হায়, আমার পরিবার!! এতে আমরা সবাই আশ্চার্যান্বিত হয়ে দৌড়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? কি হয়েছে? এমন করছো কেন?

সে উত্তরে বললো, আমি আজ দীর্ঘদিন যাবত একট স্বপ্ন হৃদয়ের গহীন কোণে লালন করে আসছিলাম। আমরা বললাম-

ঃ কি সেই স্বপ্ন? একটু খুলে বল।

ঃ আমার স্বপ্ন ও তামান্না ছিল, খোদার রাহে শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শুধু জিহাদই করে যাব। কখনো বিবাহ করবো না। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে জান্নাতের ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের বিবাহ পড়িয়ে দিবেন। কিন্তু হায়! আজ দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ আমার মনের আশা পূরণ হলো না। শাহাদাতের মধুময় পেয়ালা পানে ধন্য হতে পারিনি আমি। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, এ সফর থেকে ফিরে গিয়ে বিবাহ করে ফেলবো।

এ চিন্তা করতে করতে এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি আমাকে লক্ষ্য করে বলছে, তুমি নাকি বাড়ীতে ফিরে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছো? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

লোকটি আমাকে বললো, আরে, আল্লাহর বান্দা! তোমাকে তো আল্লাহ তায়ালা ভাসা ভাসা চোখ ওয়ালী পরমা সুন্দরী বেহেশতী হুরের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দিয়েছেন। চল আমার সাথে। আমি তোমাকে সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি। একথা বলে সে আমাকে সবুজ ঘাস বিছানো একটি ময়দানে নিয়ে গেল। আমি সেখানে দেখলাম, ১০ জন অনিন্দ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে অতি মনোরম কারুকার্যের বস্তু রয়েছে যা তারা তৈরী করছিল।

আমি তাদেরকে বললাম। তোমাদের মাঝে কি জান্নাতের হুর আছে? তারা উত্তরে বলল, আমরা কেউ জান্নাতের হুর নই। আমরা হলাম জান্নাতী হুরের খাদেমা। আপনি আরো সামনে

একটু সামনে এগিয়ে দেখি, সেখানে পূর্বের চেয়ে বহুগুণে সুন্দর সবুজ-শ্যামল একটি বাগান রয়েছে। যার মধ্যে কয়েকজন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে ছিল। তাদের চেহারা ও শারীরিক গঠন এমন আকর্ষনীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, পূর্বের ১০ জনের সাথে তাদের কোন তুলনাই হতে পারে না। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরাই কি জান্নাতের হুর? জবাবে তারা বলল- না, আমরা হুর নই। আমরা সবাই তার খাদেমা। আপনি আরও সামনে অগ্রসর হউন।

অতঃপর আমি আরও সামনে অগ্রসর হই। যেতে যেতে আমি এমন এক সুন্দর ও মনোরম বাগানের সন্ধান পাই যা পূর্বের বাগানের চাইতে অনেক বেশী চমৎকার ও আকর্ষনীয়। সেখানে আমি ৪০ জন সুন্দরী মেয়ে দেখতে পাই যাদের সামনে পূর্বের দেখা মেয়েদের কোন মূল্যই নেই। আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের মাঝে কি জান্নাতের সুন্দরী হুর আছে? তারা সকলেই উত্তর দিল, আমরা সবাই তার খাদেমা। আপনি আরও সামনে বাড়ুন। আমি আরও সামনে অগ্রসর হয়ে মুতি দ্বারা নির্মিত একটি নজরকাড়া অট্রালিকা দেখতে পেলাম। যার মাঝে চৌপায়া একটি খাটে এমন পরমা সুন্দরী এক মেয়ে ছিল যার তুলনা কেবল সে নিজেই হতে পারে। তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে আমি নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এভাবে কতক্ষণ চলে গিয়েছিল তা আমার জানা নেই। এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমিই কি জান্নাতের আয়তলোচনা হুর? সে উত্তরে বললো, হ্যাঁ, আমিই আপনার সেই কাংখিত হুর। আসুন আসুন। আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। আমি তার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে সে বললো, জনাব, একটু থামুন। ধৈর্য ধরুন। আপনি তো এখনো জীবিত। আর জীবিত অবস্থায় আমাদের স্পর্শ করা যায় না। তবে সুসংবাদ শুনে রাখুন, আজ সন্ধ্যে বেলা আপনি আমার সাথে বসে ইফতার করবেন।

মেয়েটির একথা বলার সাথে সাথে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার বিশ্বাস আজকেই আমি খোদার রাহে শহীদ হব এবং ঐ সুন্দরী হুরের সাথে একত্রে বসে ইফতার করবো। আপনারা

একটু পূর্বে আমার যে অস্থিরভাব লক্ষ্য করেছেন তা এজন্যেই। আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করে শহীদদের সীমাহীন মর্যাদা লাভের জন্যেই আমার এ ব্যাকুলতা। হে খোদা! তুমি আমাকে কবুল কর।

ঘটনার বর্ণনাকারী আবু বকর ইবনে আনাছ (রা.) বলেন, যখন এ নওজোয়ান এসব কথাবার্তা বলে শেষ করলো, ঠিক তখনই এক ঘোষণাকারী আওয়াজ দিয়ে বলে উঠল, হে আল্লাহর সৈনিক দল! নিজেদের সাওয়ারীতে আরোহন কর। তোমাদেরকে এখনই আবার শত্রুদের মোকাবেলা করতে হবে।

ঘোষণা শুনার সাথে সাথে আমরা নিজ নিজ সাওয়ারীতে আরোহন করে দুশমনের মোকাবেলায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। শুরু থেকেই আমি ঐ ব্যক্তির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখছিলাম। দীর্ঘক্ষণ যাবত তুমুল লড়াই চলছে। আমাদের তরবারীর প্রচন্ড আঘাতে শত শত কাফেরের জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। দু'চার জন মুসলিম মুজাহিদও শহীদের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হচ্ছেন। কিন্তু কই, সে নওজোয়ান তো শহীদ হচ্ছে না। এদিকে সূর্যাস্তের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। এখনই সূর্য অস্ত যাবে। আমি অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে একবার সেই ব্যক্তির দিকে আরেকবার সূর্যাস্তের দিকে তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, তার শিরখানা মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একদিকে পড়ে গেল। এদিকে সূর্যও অস্তমিত হল। আমি বুঝতে পারিনি উভয়ের মাঝে কোনটি পূর্বে হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। তবে তোমরা তা বুঝ না।' (সুরা বাকারা-১৫৪)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে জেহাদী জযবা দান করুন এবং শহীদের অমীয় সুধা পান করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার তাওফীক নসীব করুন। আমীন॥ ❐

সমাপ্ত

:-সূচীপত্র:-

এই বই তাদের জন্য

- যারা বিভিন্ন প্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে প্রয়োজনীয় মানবীয় গুণাবলী অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করতে চান।
- যারা ঈমানের মজবুতী ও নিস্তেজ হয়ে পড়া জেহাদী চেতনাকে শাণিত করতে চান।
- যারা প্রিয়জনকে এমন কোন অমূল্য গ্রন্থ উপহার দিতে চান যা উপহার গ্রহীতাকে কেবল খুশিই করবে না, হৃদয়ের খোরাকও যোগাবে।
- যারা স্বীয় সন্তান কিংবা অন্য কোন আপনজনকে নেককার, খোদাভীরু, চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য কোন ভাল বই খোঁজ করছেন।
- যারা নিজেদের পাঠাগারগুলোকে নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমানের বই দ্বারা সমৃদ্ধ করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।
- যারা চরিত্রগঠনমূলক হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী গল্প-কাহিনী পড়তে ভালবাসেন।
- যারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদানের জন্য সন্তোষজনক কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।
- যারা নিজেদের ভাষণ-বক্তৃতাগুলোকে আরও তেজোদ্দীপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার মাধ্যমে মুসলমান নর-নারীদের জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন।

বইটি নিজে পড়ুন। সংগ্রহে রাখুন।
ভাল লাগলে অপরকেও উৎসাহিত করুন।